নাটিকা

সুশীলা দত্ত

৬, কলেজ স্কোয়ার
কলিকাতা-১২

প্রথম সংস্করণ :
মার্চ, ১৯৫৬

প্রকাশক :
অমল রায়চৌধুরী
জাতীয় সাহিত্য পরিষদ
৬, কলেজ স্কোয়ার
কলিকাতা-১২

প্রচ্ছদপট :
পূর্ণেন্দু পত্রী

বাঁধাই :
ওরিয়েণ্ট বাইণ্ডিং ওয়ার্কস্

মুদ্রণ :
নরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়
স্বপ্না প্রেস লিমিটেড
৮।১, লাল বাজার স্ট্রীট
কলিকাতা-১

হাজারো রকমের মানুষ নিয়ে এই পৃথিবীতে আমরা বাসা বেঁধেছি। এক জনের সঙ্গে আর এক জনের ঠিক-ঠিক মিল কোথাও নেই। চলা-ফেরা-বলা হাসি-কান্না চিন্তা-ভাবনা সব কিছুতেই যার-যার বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট। কাজেই পদে-পদে আসে সংঘাত। তবুও মানুষ এরই মাঝে মিল খুঁজে বেড়ায়। এই সামঞ্জস্য বিধানের কী প্রাণান্তকর প্রয়াসই না তাকে করতে হয়!

অন্নআহরণে সে বার হয়। সংসার গড়ে। উচ্চাশা পোষণ করে। প্রতিষ্ঠা চায়। ভালোবাসা চায়। ব্রহ্মাণ্ডলোকের যা কিছু তার [illegible] তারই অধিকারী হওয়া তার কাম্য।

অথচ বিস্ময়ের যে তার দুর্বলতা সম্পর্কে সে সদাজাগ্রত নয়। সঠিক কোন্ বস্তুটির অভাববোধ এই সামঞ্জস্য বিধানে পরিপন্থীভূমিকা গ্রহণ করছে তার হদিস সে খুঁজে নিতে অপারগ।

সঠিক বস্তুটিকে বাদ দিয়ে খোঁসা বর্ণাঢ্য করতে সে ব্যস্ত। কাঠামোকে তাচ্ছিল্য করে অবয়ব সৃষ্টিতে বিভোর। ভিত পাকা না করে ইমারত গড়ে। জীবনে ধ্বস যেদিন নামে সেদিন সে অদৃষ্টকে অপবাদ দেয় অথবা অন্যকে দায়ী করে উন্মত্ত হয়ে ওঠে। কিন্তু চরম সংকট সেদিন রুদ্ধ হয় না। সামান্য স্ফুলিঙ্গের স্পর্শেই সুসজ্জিত সংসার নিমেষে জতুগৃহের মত ভস্মীভূত হয়ে যায়। অবশ্যম্ভাবী এ-দুর্যোগ রোধ করার সামান্যতম অবকাশও পাওয়া যায় না।

পথ চলতে গিয়ে কত ঘটনাই না আমাদের চোখের সামনে এসে হাজির হয়। সেই সব ঘটনা সাধারণ দৃষ্টিতে রসসাহিত্য পর্যায়ভুক্ত বলে মনে হয় না। কিন্তু তার অন্তঃস্থলে প্রবেশে এক 'বিচিত্র জীবনের পরিচয় মেলে। পারিপার্শ্বিক জীবনের বহর এও অচ্ছেদ্য অংশী।

হয়তো বেশি সংখ্যকের ভিড়ে স্থান তার নগণ্য তবুও সে স্থানভুক্ত একথা অস্বীকার করার উপায় নেই।

আমার পূর্ববর্তী নাটকগুলিতে আমি সেই বহুসংখ্যক মানুষের কথাই বলেছি। এই নাটকে নগণ্যস্থানভুক্ত কয়েকটি মানুষের পরিচয় দিলাম।

পরিশেষে, নিজের কথা কিঞ্চিৎ বলা প্রয়োজন। কোন নাটক পাণ্ডুলিপি থেকে পুস্তকাকারে প্রকাশের পূর্বে আমার শুভানুধ্যায়ী অজস্র বন্ধুরা হন আমার প্রথম পাঠক। তাঁদের বহুবিধ সহায়তা আমাকে নতুন নতুন নাটক লিখতে অনুপ্রেরণা দেয়। তাঁদের ঋণ অপরিশোধনীয়।

এই নাটকে বন্ধুবর সুনীল ঘোষ, অরুণ রায়, অনিল ঘোষ, নির্মল সর্বজ্ঞ নানাভাবে আমাকে সহায়তা করেছেন। প্রচ্ছদপট ও অন্যান্য চিত্রাঙ্কনগুলি করেছেন কবি ও শিল্পী পূর্ণেন্দু পত্রী। এঁদের সকলের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

অভিনীত না হলে নাট্যরচনার সার্থকতা নেই। আমার পূর্ববর্ত্তী নাটকগুলি বাংলার বিভিন্ন শহরে বহুরাত্রি অভিনীত হয়েছে ও হচ্ছে। সব-সংবাদই সংবাদপত্রের মাধ্যমে জেনেছি। ব্যক্তিগতভাবে এইসব নাট্য-সংঘের শিল্পীদের অভিনন্দন জানাবার সুযোগ না পাওয়ায় এবারে তাঁদের কাছেও আমার কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

১।৩ বি, পরমহংস দেব রোড,
কলিকাতা-২৭

সুনীল দত্ত
২৬শে মার্চ, ১৯৫৬

বাংলার নাট্য আন্দোলনে যে-প্রাণ উৎসর্গীকৃত,
সেই মহান শিল্পী মহর্ষি মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের
অমর স্মৃতির উদ্দেশে উৎসর্গ করলাম আমার
এই সামান্য উদ্যম।

॥ চরিত্র লিপি ॥

অমর

অভয়

রবি

অজয়

খগেন

ভবেশ

সেলিম

পুলিশ অফিসার

শিখা

॥ প্রথম অঙ্ক ॥

পর্দা উঠতে দেখা গেল মঞ্চ ঘুটঘুটে অন্ধকার। কোথাও একটু আলোর রেশ নাই। দূরে একটা গ্যাসের আলো টিম-টিম ক'রে জ্বলছে।

অন্ধকারে দূরে কয়েকটা গাছ ও জঙ্গল দেখা যায়। মঞ্চ জন-মানব শূণ্য। একটানা ঝিঁঝিঁ পোকার ডাক।

কিছুক্ষণ পরে মানুষের পায়ের শব্দ শোনা গেল। লোকটি মঞ্চে আসার পর অন্ধকারে মনে হ'ল লোকটির পরনে সাদা জামাকাপড় এবং হাতে একটা ফাইল রয়েছে। তাঁর ধীর পদক্ষেপ দেখে মনে হয় গভীর চিন্তায় মগ্ন।

হঠাৎ পিছনের জঙ্গলে একটা শব্দ হ'ল। লোকটি চমকে ফিরে দাঁড়াল। সব চুপচাপ। আবার সে ধীরে ধীরে এগুল। আবার শব্দ। এবার লোকটি থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। জঙ্গলের মাঝে একটি ছায়া দেখা যায়। লোকটি থমকে দাঁড়াল। হঠাৎ একটা রিভলবারের গুলির আওয়াজ শোনা গেল। সঙ্গে সঙ্গে লোকটি ওঃ-মাগো বলে আর্তনাদ করে বসে পড়ল। ছায়াশরীর এদিকে ফিরে তাকাল। আবার একটা গুলির শব্দ। তারপর সব চুপচাপ। শুধু ভেসে এল মৃতপ্রায় কুকুরের আর্তনাদ। পিছনের ছায়াটি আস্তে আস্তে পা টিপে-টিপে এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে মঞ্চের মাঝখানে এল। তার মুখে একটা কাপড় বাঁধা। উত্তেজনায় কি ভয়ে সে থরথর করে কাঁপছে। তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে মৃত লোকটির হাত থেকে ফাইলটা নিয়ে চলে যেতে গিয়ে হঠাৎ থমকে দাঁড়াল। ফাইলটা খুলে ভেতর থেকে কিছু কাগজপত্র বার করে নিল, তারপর ফাইলটা ছুড়ে ফেলে দিল। হঠাৎ পিছনের জঙ্গলে আবার শব্দ হ'ল। ছায়াশরীর চমকে উঠেই নিজের পকেট থেকে রিভলবার বার করে শব্দ লক্ষ্য করে বাগিয়ে ধরল। না, কিছু না। চারিদিক আবার নিস্তব্ধ। আবার মৃত লোকটির পকেটে হাত দিয়ে ভেতর থেকে কতকগুলো কাগজ বার করল। হাতটা রক্তে একেবারে ভিজে গেছে। একটু ভেবে পকেট থেকে একখানা রুমাল বার করে হাতটা মুছে রুমালটা ফেলে দিল। এই সময়ে দূর থেকে একটা ঘণ্টা বাজার শব্দ ভেসে এ'ল। ছায়াশরীর একটু ইতস্ততঃ ক'রে কোন্‌দিকে যাবে স্থির করতে না পেরে যেদিক দিয়ে এসেছিল সেদিকে চলে গেল।

মঞ্চ জনমানব শূণ্য। কেবল মাঝে মাঝে গাছের ওপরে বাতাসের সোঁ সোঁ শব্দ শোনা যায়। এই সব কিছু ছাপিয়ে ভেসে আসে কোনও আত্মভোলা শিল্পীর বাঁশীর অপূর্ব সুরের মূর্চ্ছনা।

॥ পর্দা ॥
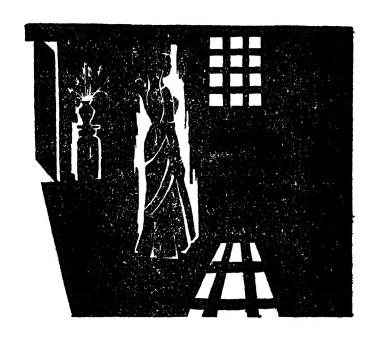
॥ দ্বিতীয় অঙ্ক ॥

মঞ্চের পিছনে ডানদিকের কোনে একটা দরজা। তাতে একটা জালের পর্দা লাগান। ভেতরে একটা আলো জ্বলছে। মঞ্চের মাঝামাঝি জায়গায় একটা জানলা তাতেও একটা পর্দা টাঙান। সেখান থেকেও কিছুটা আলো আসছে। আর বাঁদিকে বাইরে যাবার একটা দরজা।

মঞ্চের মাঝামাঝি জায়গায় একটা বেঞ্চি পাতা আছে। পেছনে একটা ফুলদানীতে কিছু শুকনো ফুল। এদিক-ওদিকে খান-কয়েক চেয়ার এবং

একটা টেবিল রয়েছে। সমস্তই যেন আগোছাল অবস্থায় পড়ে আছে। দেয়ালে কয়েকটি ছবি। সবই দেশবরেণ্য নেতাদের।

পর্দা উঠতে দেখা গেল বছর ২৭-এর একটি মেয়ে জানালার কাছে দাঁড়িয়ে আছে। অপূর্ব সুন্দরী। কিন্তু মুখখানা বিষাদমাখা। উদাসভাবে কি যেন ভাবছে। ········কিছুটা সময় কেটে গেল। বাইরের দরজা দিয়ে দ্রুত প্রবেশ করে অভয়। বছর ৩৫ বয়স। বেশ সুপুরুষ। হাসিমুখে হাতে একগোছা রজনীগন্ধা নিয়ে কি যেন ব'লতে ব'লতে প্রায় হাঁপাতে হাঁপাতে সে ঢুকল। বাইরে থেকেই ডাকল—শিখা।

অভয় : শিখা, আজ --

[বলতে গিয়ে চুপ করে যায়]

কি ব্যাপার? ও বুঝেছি! [দীর্ঘশ্বাস] তুমি এখনও ভুলতে পারনি? [নরমস্বরে] দেখ, তোমায় একটা কথা বলি। অমরের সঙ্গে আমারও বন্ধুত্ব ছিল। এখন ভেঙ্গে পড়লে চলবে না। অনেক কাজ আছে। তোমার আর কদিনের আলাপ! বড়জোর একবছর। আর আমার?··· ১৫ বছর। নাও, ওঠ। এমনি ভাবে ভেঙ্গে পড়লে কি চলে? কাজকর্ম তো কিছু করতে হবে! বল দিকি—ঘরটার কি অবস্থা হয়েছে?

ফুলদানীর শুকনো ফুলগুলো আজ চারদিন ধরে ফেলে দেব ভাবছি—তাও হচ্ছে না। এবার একটু গা ঝাড়া দাও।·· যাও ফুলগুলো সাজিয়ে রাখ।

[শিখা এতক্ষণে বহুকষ্টে উঠে দাঁড়াল। অভয়ের হাত থেকে ফুল নিয়ে ফুলদানীর দিকে যায়। অভয় হাত ধরে বলে]

উঁ-হুঁ। ওটি হবে না। [পরস্পর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে] একটু মিষ্টি হাসি। এই রজনী-গন্ধার পরিবর্তে তোমার মুখের একটু হাসি পাবারও কি যোগ্য আমি নই ?

[শিখা হাসবার ব্যর্থ চেষ্টা করল। অভয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে—সরে গিয়ে সুইচ টিপে আলোটা জ্বেলে ফুলদানীর পাশে গিয়ে দাঁড়াল। শুকনো ফুলগুলি ফেলতে গিয়ে কম্পিত হাতে দাঁড়িয়ে পড়ল। মুখখানা বেদনায় করুণ হয়ে উঠল। পাষাণের মত দাঁড়িয়ে রইল।··· অভয় টেবিলগুলি গুছিয়ে রাখছিল। হঠাৎ নজরে পড়ল শিখা শুকনো ফুল হাতে দাঁড়িয়ে আছে।]

অভয়　：　কি হোল? শুক্‌নো ফুল হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছ কেন? ওঃ বুঝেছি—অমর তোমায় প্রেজেণ্ট করেছিল। তা ওগুলো না ফেলে বাড়ির মধ্যে কোথাও রেখে দাও। বাইরের ঘরে ঐ মরা ফুল না রাখাই ভাল—কি বল, এঁ্যা?

[একটু চুপ করে থেকে অভিমানভরা স্বরে]

তুমি কথা বলছ না কেন?

[শিখা নিঃশব্দে কাজ করে যায়। তার নিরবতায় অভয় চটে যায়। উত্তেজিত স্বরে বলে]

কৈ, শুনতে পাচ্ছো?

[শিখা ঘুরে অভয়ের মুখের দিকে তাকায়। অভয় নরম হয়ে যায়]

না-মানে—বলছি কি, তুমি কথা বল। · আজ তোমার জন্য একটা জিনিষ এনেছি—বল দিকি কি?

[এমন সময় ২৭।২৮ বছর বয়সের একজন যুবক প্রবেশ করে। নাম রবি। রবিকে দেখে অভয় অপ্রস্তুত হয়ে কথা ঘুরিয়ে নিয়ে ব'লল]

এই যে, রবি, এসেছ? তারপর, কি মনে করে?

['রবি' নামটা শুনে শিখা ফিরে দাঁড়াল। খুশি হয়ে রবির দিকে তাকায়]

রবি : বলছি! ...শিখা, এককাপ চা নিয়ে এস! বড় ঠাণ্ডা।

শিখা : আনছি। [তাড়াতাড়ি চলে গেল। শিখার পরিবর্তন অভয়ের চোখ এড়াল না]

অভয় : তারপর, রবি, কি মনে করে?

রবি : জানেন, অভয়দা—অমরদার খুনের ব্যাপারটা নিয়ে কারখানায় হৈ-চৈ বেঁধে গেছে। সর্দাররা পর্যন্ত বলছে অমরবাবুকো কোন্ খুন কিয়া? এ তো বরে তাজ্জব বাত। সত্যি, অভয়দা, ব্যাপারটা খুবই ঘোলাটে।

[খগেন প্রবেশ করে। সঙ্গে ভবেশ। সবাই মজুর। খগেন একটু তোৎলা। শেষোক্ত মজুর কথার ফাঁকে ফাঁকে চিরুণী দিয়ে মাথা আঁচড়ায়। দু'জনে খুব তর্ক করতে করতে প্রবেশ করে।]

খগেন : তু-তু-তুই কি জানিস, কোনও বে-বেটা বলতে পারেনা—

ভবেশ : থাক্ বাবা, আর তর্ক ক'রে লাভ নেই।

অভয় : তারপর —তোমাদের খবর কি?

খগেন : কি-কি-কিছুই পেলাম না, অ-অ-অভয়দা!

ব্যা-ব্যা-ব্যাপারটা ভৌ-ভো-ভৌতিক।

[শিখা দুকাপ চা নিয়ে ঢোকে]

রবি : দাও, আমারটা আগে দাও— তোমরা পরে এসেছ, তোমাদের ভাগ্যে চা নেই। [চায় চুমুক দিয়ে] হুঁ—কি বলছিলে, খগেন ?

খগেন : ব-ব-বলার আর কি আছে ? এ-এ রকম ঘটনা তো আমাদের এ-এ-এখানে অনেক ঘটেছে।

ভবেশ : কিন্তু এটি একেবারে অন্যরকম। আমি বুঝতে পারছি না—অমরদাকে কে খুন করল ? সত্যি অভয়দা, এই চারদিন বিছানা থেকে একেবারে উঠতে পারিনি।

রবি : [চায়ে চুমুক দিয়ে] এমন যে একটা ঘটনা ঘটবে তা আমরা একেবারে ভাবতেই পারিনি।

ভবেশ : আজ চারদিন হ'ল অমরদা চলে গেছে ; কিন্তু প্রতি মুহূর্তে আমার মনে হচ্ছে ঐ যেন বসে আছে !

রবি : চারদিন আগেও আমরা একসঙ্গে মিটিং করেছি। আমি সেদিনও বলেছিলাম অমরদা পৌঁছে দিয়ে আসব ? বললেন, না — আমায় কেউ মারবে না।

শিখা : সত্যি, কি যেন ঘটে গেল—না !

রবি : [খবরের কাগজটা খুলে পড়তে পড়তে] আরে এই যে, শোন শোন, সংবাদটা কাগজে বেরিয়েছে।

"জনৈক ভদ্রলোক গত শনিবার রাত্রি একটা নাগাদ গার্ডেনরীচ সার্কুলার রোড ধরিয়া যাইতেছিলেন। পথে একদল দুর্বৃত্ত তাঁহাকে অতর্কিতে আক্রমণ করিয়া হত্যা করে। তাঁহার পকেট হইতে কাগজ-পত্র টাকাপয়সা হস্তগত করিয়া পালাইয়া যায়। মৃতদেহের কপালে এবং পেটে গুলির আঘাত ছিল। পুলিশ জোর তদন্ত করিতেছে"।

শিখা : টাকা পয়সা ছিনিয়ে নিয়েছে।

রবি : আমিও তো কিছু বুঝতে পারছি না। সেদিন অমরদার পকেটে তো চারটা পয়সাও ছিল না।

খগেন : [বেঞ্চ থেকে লাফিয়ে উঠে] পু-পু- পুলিশ নিশ্চয়ই ম্যা-ম্যা-ম্যানেজার বা-বুর কাছ থেকে ঘুষ খেয়েছে। দেখছেন না কেস্‌টা কেমন ঘু-ঘু-ঘুরিয়ে দে-দে-দেবার চেষ্টা ক'রছে।

রবি : আশ্চর্য ব্যাপার! শহরে এতবড় একটা ঘটনা ঘটে গেল আর পুলিশ এখন পর্যন্ত একটা তদন্ত পর্যন্ত ক'রলে না! অভয়দা, চা-টা জুড়িয়ে গেল যে –

অভয় : [চমকে] এ্যা?—ও হ্যাঁ।

[আস্তে আস্তে চায় চুমুক দেয়। প্রবেশ করে অজয়, সঙ্গে পুলিশ অফিসার]

অজয় — বৌদি, তুমি ভেতরে যাও।...রবিদা, পুলিশ অফিসার এসেছেন কি সব জানতে!

অফি — [বাইরের দিকে তাকিয়ে] তোমরা ঐখানে দাঁড়াও, আমি এক্ষুনি আসছি! [ভেতরে এসে] নমস্কার!

রবি — নমস্কার! বসুন!

অফি — হ্যাঁ, দেখুন- শনিবারের ঐ মার্ডার কেস্‌টার সম্বন্ধে কিছু জানতে এলাম! [কাগজপত্র নিয়ে বসল] আচ্ছা, আপনার নামটা—?

রবি — রবিন দত্ত।

অফি — হুঁ! [লিখে নিয়ে] আপনি কি করেন?

রবি — এই মিলে কেরানীর কাজ করি।

অফি — কতদিন কাজ করছেন?

রবি — এই বছর দুই হবে!

অফি — মার্ডার হবার দিন আপনি কোথায় ছিলেন?

রবি — আমরা সবাই একসঙ্গে মিটিং করছিলাম!

অফি — রাত কটা অবধি মিটিং চলেছিল?

রবি — তা প্রায় ১২॥টা হবে।

অফি — আচ্ছা, ঐ ভদ্রলোক অর্থাৎ কি নাম যেন ওঁর?

রবি — অমরেন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

অফি — হ্যাঁ—ওঁর সাথে আপনাদের কি সম্পর্ক ছিল?

রবি — উনি আমাদের ইউনিয়নের সেক্রেটারী ছিলেন।

কেবল মাত্র মিল ম্যানেজমেণ্টের দু'একজন বড় কর্তা ছাড়া ওঁর আর কোন শত্রু ছিল বলে আমরা জানতাম না! এমন কি মিল ব্যাবাকের গুণ্ডারা পর্যন্ত অমরদাকে শ্রদ্ধা করত! কারণ অমরদার কাছ থেকে সাহায্য পায়নি—এমন লোক মিলে কম।

অফি : হুঁ! অতো কথা আমি জানতে চাই নি। [ভবেশকে] আচ্ছা, আপনার নামটা?

ভবেশ : ভবেশ দলুই!

অফি : আপনিও তো ঐ মিলে কাজ কবেন—তাই না?

ভবেশ : হ্যাঁ—মেশিনে কাজ করি।

অফি : হুঁ! আপনি ঐদিন কোথায় ছিলেন?

ভবেশ : মিটিং-এই ছিলুম।

অফি : মিটিংটা কোথায় হয়েছিল?

ভবেশ : আমার বাড়িতে।

অফি : মিটিং শেষ হবার পর আপনি বাড়িতেই ছিলেন, না বাইরে বেরিয়েছিলেন?

ভবেশ : বাড়ি থেকে বেরোইনি।

অফি : এই খুন সম্বন্ধে আপনার কি মনে হয়?

ভবেশ : দেখুন, এই কারখানায় যখনই কোনও আন্দো-লনের ঢেউ উঠেছে—তখনই আমরা একজন নেতাকে হারিয়েছি। এবারও অমরদার নেতৃত্বে

আমরা আমাদের দাবীর লড়াইয়ে একধাপ এগিয়ে গিয়েছিলাম—টোকেন ষ্ট্রাইকের সিদ্ধান্ত নিয়ে—তাই তাঁকে মালিকের রোষানলে পড়তে হ'ল !

অফি : [থামিয়ে দিয়ে] আপনারা বড় বেশি কথা বলেন। যা জানতে চাই তাই বলুন। আপনি কতদিন কাজ করছেন ?

ভবেশ : এই দশ বছব হ'ল।

অফি : হুঁ— [খগেনকে] আপনাব নাম ?

খগেন : খগেন মাইতি।

অফি : আপনিও ঐ মিলে কাজ কবেন—না ?

খগেন : আজ্ঞে হ্যাঁ।

অফি : কি কাজ ?

খগেন : কাপড়েব থাক্ দেওয়া !

অফি : আচ্ছা ! [অজয়কে] আপনাব নাম ?

অজয় : অজয় কুমার বোস !

অফি : আপনিও কি ঐ মিলে কাজ করেন ?

অজয় : আজ্ঞে হ্যাঁ—একেবারে খাঁটি মজুর !

অফি : ঐ দিন আপনি কোথায় ছিলেন ?

অজয় : আজ্ঞে অতো রাত্রে কোথায় আর যাব বলুন—এই বাড়িতেই ছিলাম।

অফি : আপনি বুঝি এখনও নেতা হবার যোগ্য হন নি ?

অজয় : আজ্ঞে. ট্রেণিংএ আছি।

অফি : এবার কি আপনার পালা ?

অজয় : আজ্ঞে না। এখনো রবিদা আছেন—ভবেশদা আছেন, তারপর আমার পালা।

রবি : আচ্ছা, ওর কাছে কোন ফাইল পত্র পেয়েছিলেন ?

অফি : হ্যাঁ—একটা ফাইল ছিল, তবে কাগজপত্র কিছু ছিল না। কিন্তু পকেটে আঙ্গুলের ছাপ রয়েছে।

অভয় : এ্যাঁ—তাই নাকি ?

অফি : আর একটা রক্তমাখা রুমাল—হাতের কাজ করা, পাশেই পাওয়া গেছে! রক্তের দাগ দেখে মনে হ'ল পকেটে খুব ঘাটাঘাটি হ'য়েছে!··· ভাল কথা··· [অভয়কে] আপনার নামটা বলুন তো।

অভয় আমার··· ?

অফি হ্যাঁ।

অভয় অভয় বোস্।

অফি কি কাজ করেন ?

অভয় ঐ টেক্সটাইল মিলের ডিপার্টমেণ্টাল ইন-চার্জ।

অফি এই ইউনিয়নের সঙ্গে আপনার কি সম্পর্ক ?

অভয় আমি এই ইউনিয়নের প্রেসিডেণ্ট। আর আমার এই ঘর আমি ইউনিয়নকে দান করেছি। এই ইউনিয়ন গড়ার মূলে অমরবাবুর যতটা দান আছে, আমার তার চাইতে কিছু কম নেই!

অফি : আচ্ছা—আপনি তো ঐ মিটিং-এ ছিলেন ?

অভয় : আমি—হ্যাঁ, ছিলাম !

অফি : মিটিং থেকে আপনি সোজা বাড়ি চলে এসে-ছিলেন ?

অভয় : [অন্যমনস্ক ছিল] এ্যাঁ··· ! কি বললেন ?

অফি : বলছি—মিটিং থেকে আপনি সোজা বাড়িতে এসেছিলেন, না অন্য কোথাও গিয়েছিলেন ?

অভয় : হ্যাঁ—আমি বাড়িতেই এসেছিলাম ।

অফি : আপনার কি মনে হয় ?

অভয় : আ-আমার ? না কিছু না !

অফি : আচ্ছা ঠিক আছে ।

[কাগজপত্র গুছাতে থাকে]

কিছু মনে করবেন না, আমার ইন্‌ভেস্টিগেশনের সুবিধার জন্য একটা কথা জিজ্ঞেস ক'রতে চাই !

অভয় এ্যাঁ ! হ্যাঁ, বলুন ।

অফি আমি একজন মজুর সম্বন্ধে কিছু জানতে চাই । যেদিন খুন হয়েছিল—তার পরদিন ভোরবেলা 'সেলিম' নামে একজন বাঙ্গালী মজুর ট্রেণে বনগাঁর দিকে রওয়ানা হয়েছে। তার সম্বন্ধে আপনারা কি কিছু বলতে পারেন ?

রবি : না—না তার সম্বন্ধে ভাববার কোন কারণ নেই !

অভয় : আছে। এ সমস্ত ব্যাপারে কোনও জিনিষ এত সহজভাবে উড়িয়ে দেওয়া উচিত নয়। কিছু মনে

করবেন না, স্যার, আপনারা প্রপার ইনভেস্টিগেশন করুন......আমারও কেমন সন্দেহ হ'চ্ছে। ঐদিন ভোরেই সে রওনা হোয়েছে-না......?

রবি : কি বলছেন, অভয়দা? সেলিম? একেবারে গোবেচারা যে!

খগেন : ওরা সা-সা-সাপের জাত! বি-বি-বিশ্বাস করা চলে না।

ভবেশ : আমিও ভাবতে পারছি না—সেলিম?

অফি : ঠিক আছে। এ নিয়ে ভাববার কিছু নেই। তদন্ত চলবে। আমি এখন চলি।

অভয় : একটু চা খেয়ে যান!

অফি : আজ থাক, অভয়বাবু; এ কেস্‌তো সহজে মিটবে না! আবার আপনাদের জ্বালাতে আসতে হবে। নমস্কার।

সকলে : নমস্কাব!

[প্রস্থান। কিছুক্ষণ সবাই চুপচাপ]

খগেন : শা-শালা কি করলে? শে-শেষে অমরদাকে খুন করলে? দাঁ-দাঁড়াও - আমার নাম খ-খ-খগেন।

রবি : কি, খগেন, তুমি কি একেবারে ধরে নিলে সেলিম খুন করেছে?

খগেন : না ধ-ধরার কি আছে? বু-বুঝলেন ঐ লে-লেড়েটা দা-দাঙ্গার সময় কত হি-হিন্দুকে খু-খুন করেছে?

রবি : তাই নাকি ?

খগেণ : নি-নিশ্চয়ই, আমি নি-নিজে দেখেছি—ও রিভলবার চা-চালাতে জানে। এ-এমন কি স্টে-স্টেন গানও।

অজয় : তোব মত এমন একটা জাঁদরেল হিন্দুকে সামনে পেয়েও মাবল না !

খগেন : আমায় মা-মারে বোন শালা ? টেংরি খু-খুলে নেবনা, আমাব নাম খগেন—

ববি : কেন বাজে বকছো ?

অজয় : আমি জানি দাঙ্গাব সময় ঐ সেলিমই অমবদাকে আশ্রয় দিয়েছিল।

খগেন : থাক, থাক, খু-খুব হয়েছে। লে-লেডে আবাব আশ্রয দেবে—হ্যাঁ !

ভবেশ : আমি জানি সে আশ্রয় দিয়েছে—বদনাম দিলেই হ'ল।

রবি : যাক, বাজে ঝগড়া ক'রে লাভ নেই। সোজা কথা, প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত তোমরা এ নিয়ে আলোচনা করবে না। সন্দেহ করে কাউকে তো আর ফাঁসি দেওয়া যায় না।

অভয় : সে তো নিশ্চয়ই। ও সব নিয়ে আলোচনা না করাই ভাল।

রবি : এখন অমরদা যে কাজটা অসমাপ্ত রেখে গেছে

সেইটে কি ক'রে সমাপ্ত করা যায় এসো তার চেষ্টা করি।

অভয় : [মুখের দিকে তাকিয়ে] কেমন ক'রে ?

রবি : কেন ?

অভয় : কাগজপত্রগুলো তো চলে গেছে—এখন আবার নতুন ক'রে সই-সাবুদ করাতো দরকার !

রবি : করতে হবে। দিন-দিন ম্যানেজারের জুলুম বেড়েই চলছে। সর্দাররা তো পেয়ে বসেছে। এখন যদি আমরা চুপ ক'রে থাকি তাহ'লে ওরা আরও চেপে বসবে। জুলুম বেড়েই চলবে।

ভবেশ : তখন ইউনিয়ন গড়া আরো শক্ত হবে। রবিদা ঠিকই বলেছে। গড়তে হ'লে এক্ষুনি গড়া উচিত।

খগেন : নি-নিশ্চয়ই। অমরদার কা-কাজটাকে আমরা যদি এ-এগিয়ে নিয়ে যেতে না পারি—তা-তাহ'লে আমাদের বলবে কা-কাওয়ার্ড।

অভয় : সবই তো বুঝি—কিন্তু ক'রবে কে ?

খগেন : কেন, আ-আপনি ভয় পে-পেয়েছেন ?

অভয় : না না ভয়ের কথা নয়,······করবে কে ?

রবি : আপনি আছেন—আমরা আছি।

অভয় : আমি ? [ভেঙ্গে পড়ে] না, ভাই। আমি নেই। তোমরা খুব সহজেই ভুলে যেতে পার অমরের স্মৃতিকে, তোমাদের সঙ্গে আর কদিনের জানাশোনা !

আন্দোলনের খাতিরে তাঁর সঙ্গে তোমাদের খাতির ; কিন্তু আমরা একসঙ্গে বড় হয়েছি—একসাথে লেখা-পড়া শিখেছি। আমার দুর্দিনে সে যে কত সাহায্য করেছে—তোমরা জান না। এই ঘর যে আজ আমি ইউনিয়নকে দিয়েছি—তা কার কথায় ?

[চোখেব জল মুছতে থাকে। শিখাব প্রবেশ]

আমরা ছিলাম এক ডালে দুটি কুঁড়ি। আজ অমর নেই। আমাব বুকেব ভেতবটা যেন খাঁ-খাঁ করছে। আমার সমস্ত শক্তি চলে গেছে, ভাই। জিজ্ঞেস কর শিখাকে, আমি বিছানা ছেড়ে উঠতে পাবছি না —এত ব্যথা আমাব বাবা মরতেও পাইনি। আমাকে দয়া করে তোমরা অব্যাহতি দাও।

[সবাই চোখের জল মোছে]

ভবেশ — তা সত্যি, অমরদার অভয়অন্ত প্রাণ ছিল। দেরী যখন হয়েছে, রবিদা—তখন আরো দু-চার দিন যাক।

রবি — সবই তো বুঝি—

অভয় — কিন্তু এটাও তো বুঝতে হবে, সবাই কি ভাবে মুষড়ে পড়েছে। কারুর উঠে দাঁড়াবার কি শক্তি আছে বল !

রবি — বেশ, তাহ'লে একটা শোকসভা হ'ক।

খগেন — নি-নিশ্চয়ই। ওটা হওয়া দ-দরকার।

ভবেশ — আমার মনে হয় অমরদার শোকসভায় সবাই আসবে —সেইখানেই না হয়—।

রবি : হ্যাঁ, আমিও তাই ভাবছি। সেখানেই অমরদার প্ল্যানটা তুলে ধরব।

অভয় : দেখ, এটা কি ঠিক হবে? একটা কণ্ডোলেন্স মিটিং-এ রাজনীতি-অর্থনীতি নিয়ে আলোচনা—!

রবি : কিন্তু ব্যাপারটাতো তোলা দরকার, অভয়দা। শুধু দুঃখ করলেই তো চলবে না। বেশি দুঃখের ফল যে খারাপ হয়, অভয়দা। আমরা দুঃখে ভেঙ্গে পড়ব, আর ওরা আমাদের—।

অভয় : তুমি আর কতদিন অমরের সঙ্গে মিশেছ, রবি? মাত্র দু'বছর। আর আমার সঙ্গে কতদিনের আলাপ ছিল, জান? পনের বছর। সেই পনের বছরের প্রতিটি রাত প্রতিটি দিন আমার চোখের সামনে যেন ভাসছে। রাজনীতির কথা নিয়ে এত কপচাচ্ছো, রবি! রাজনীতি কি আমরা করিনি, ভাই?— অমর আর আমি জেল থেকে বেরুলাম—ওঃ, সেকি অভ্যর্থনা! এখনও যে সে-ফুলের মালার কথা ভুলিনি, ভাই। আমাদের শক্তি আমরা জানি, আমাদের মজুরদের আমরা চিনি।

রবি : আপনি আমায় ভুল বুঝেছেন, অভয়দা। আমি ঠিক তা বলতে চাইনি।

অভয় : ভুল বুঝাবুঝির কি আছে, ভাই। দেখ, মানুষকে ভাল না-বাসলে কিছুই করতে পারবে না।

তোমার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে, রবি। মানুষের জন্য ফিল ক'র, ভাই। বুঝলে?

রবি : যাক, এনিয়ে আর তর্ক করে লাভ কি? ঠিক আছে। তাই হবে।

অভয় : তবে হ্যাঁ, একটা জিনিস করা যায়, বুঝলে? শ্রমিকদের জন্য একটা পাঠাগার করা যায়—"অমর স্মৃতি পাঠাগার" এই রকম একটা কিছু।

ভবেশ : সে তো অনেক টাকার ব্যাপার!

অভয় : তার জন্য চাঁদা তুলতে হবে। আমি মনে করি সবাই সাহায্য ক'রবে। আমি নিজেই প্রচুর টাকা তুলতে পারব।

রবি : ভাল কথা। তাই হবে। শোকসভাতেই ওটা প্রকাশ ক'রে দেব।

ভবেশ : একটা ফোটো চাই যে।

খগেন : তা-তা-তাই তো—

রবি : কারুর কাছে নেই, না?

শিখা : আমার কাছে আছে। [অভয় ঘুরে শিখার দিকে তাকাল] আনছি। [প্রস্থান]

রবি : কে আর ভাব্‌ত অমরদা এত সহজে চলে যাবে। কি যে হবে! কোম্পানীর জুলুম এই তিন দিনে আরও বেড়েছে—অবস্থা একেবারে কাহিল। [শিখা ফোটো নিয়ে প্রবেশ করে] ধন্যবাদ, শিখা, তুমি খুব

বাঁচালে। তাহ'লে আমরা এখন উঠি। ঐ কথা রইল। চল।

খগেন : হ্যাঁ, আর বে-বেশি রাত করা ঠিক না।

ভবেশ : অভয়দা, চলি। বৌদি, যাচ্ছি। চল্, অজয়, একটু পৌঁছে দিবি।

খগেন : হ্যাঁ, চল্ দো-দোস্ত, পোঁ-পোঁছে দিবি চল্।

তারপর আমাকে শেষ করুক কেউ—

খগেন : লে-লে তোকে মারলে ধ-ধন্য হয়ে যাবি তুই !

ভবেশ : আর একই সঙ্গে শোকসভাটা হয়ে যাবে।

[অভয় আর শিখা ছাড়া সকলের প্রস্থান শিখা অন্যমনস্ক হ'য়ে সেই দিকে তাকিয়ে ছিল।]

রবি : শিখা, যাচ্ছি।

[একবার শিখার দিকে আঁড়চোখে তাকাল। শিখা ওর দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। রবি ছুটে চলে যায়।]

অভয় : দেখলে শিখা—মানুষের মন কত ছোট !

শিখা : কি ?

অভয় : রবির এটিচুটটা বুঝলে না ? অমর-এর মত একজন নেতা মরে গেল, তার প্রতি এতটুকু মমতা নেই ! এরা করবে রাজনীতি—হুঃ ! যারা মানুষকে ভাল-বাসতে জানে না—তাদের দ্বারা কিছুই হবে না। আজ আমাদের এত মর্যাদা কেন জান ? অমর

আমায় শিখিয়েছিল—মানুষকে ভালবাস, তবেই নেতা হতে পাববে।

[শিখা আস্তে-আস্তে ভেতবে চলে যাচ্ছিল]

ওঃ, কথাগুলো তোমাব ভাল লাগছে না—না? ঠিক আছে, দবকাব নেই।

শিখা : না না, ভাল লাগবে না কেন?

অজয় : ও ভাল না লাগাবই কথা! ওতে কর্কশ বাজনীতি ছাড়া আব কিছুই তো নেই। শোন, এদিকে এস।

শিখা : এ্যাঁ?

অভয় : কাছে এস।

শিখা : কেন?

অভয় : তুমি আমাব ঘরেব বৌ।

শিখা : না না, আজ তিনদিন ধরে তোমাব মনেব অবস্থা তো খুব খাবাপ। সব সময়ে বিছানায় শুয়ে আছ…।

অভয় : সত্যিই খারাপ, শিখা! আমাদেব যখন মন খারাপ, তখন তোমাদের কি করাব কিছুই থাকে না? কোনও দায়িত্বই নেই? বল, চুপ করে থেক না। আমরা যখন দুঃখ পাব, তোমরা দেবে সান্ত্বনা। তোমাদের মুখের হাসি আমাদের সব কষ্ট থেকে রেহাই দেবে, তাই না? এস।

[শিখা এগিয়ে এল]

আরও কাছে এস! তোমায় যত কাছে পাই, মন তত ভরে যায়।

শিখা : তুমি এইমাত্র কাঁদছিলে?

অভয় : তুমি কি চাও তোমার কাছেও আমি দিনরাত কাঁদব?

শিখা : না না, আমি তা বলছি না।

অভয় : [আরো কাছে সবে গিয়ে] তবে কি বলছ, বল। তুমি যা বলবে আমি তাই শুনতে প্রস্তুত।

[আলোটাব দিকে তাকিয়ে উঠে পডল]

আজ একটা মজাব জিনিস এনেছি যা দেখলে তুমি অবাক হয়ে যাবে।

[আলোটা নিবিয়ে দিল। জানলা ও দরজা দিয়ে বাইরের আলো এসে পড়ছে। পকেট থেকে একছড়া হার বের ক'বে চুপি চুপি শিখার গলায় পরিয়ে দিল।]

শিখা : এ কি? এ যে হার!

অভয় : হ্যাঁ, ছাখ, অন্ধকাবের মধ্যে হারটা কেমন জ্বলছে!

শিখা : এর যে অনেক দাম?

অভয় : তোমার চাইতে বেশি নয়। তুমি যে আমার অন্ধকারের 'মনি'।......তুমি অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকবে, আর আমি চাঁদেব মত তোমার মুখখানার দিকে তাকিয়ে থাকব।

[সামনে এসে মুখের দিকে তাকিয়ে]

বাঃ, কি চমৎকার! যেন পূ্ণিমার পূর্ণচাঁদ,......তোমার

মুখের একটু হাসি দেখলেই আমি খুশি।

[চেয়ারে বসে]

একটা কথা তোমায় আমি বলব শিখা—বল রাখবে?

শিখা : বল।

অভয় : রাখবে তো?

শিখা : চেষ্টা করব।

অভয় : [ইতস্তত: করে] না, মানে এমন কিছু নয়—তবে বলছিলাম কি—তুমি ঘরের বউ, ঐ ছেলে ছোকরাদের সামনে নাই বা এলে।

শিখা : কেন?

অভয় : না-না না। তুমি ভেবনা যে আমি তোমায় সন্দেহ করছি। তাছাড়া, তুমি অমরের সঙ্গে এত ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করতে—তার জন্য আমি তো কখনো আপত্তি করিনি। তবে আজ খারাপ অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে—তুমি এই সব গোলমালে নাই বা থাকলে, এ্যাঁ।

শিখা : কিসের গোলমাল?

অভয় : ওঃ, তুমি শোননি বুঝি? সেলিম অমরকে খুন করেছে—পুলিশ অফিসার এইমাত্র বলে গেল।

শিখা : সেলিম? কি বলছ?

অভয় : হ্যাঁ, তাইতো বলছি। এতদিন আপন সেজে ছিল—কাউকে বিশ্বাস করা যায় না—বুঝলে। এ সংসারে মানুষকে আর বিশ্বাস করা চলে না, শিখা।

শিখা : সবাই তাই ব'লছে ?

অভয় : হ্যাঁ। রবি তো বিশ্বাস ক'রতে চায় না।······কত দরদ জানা আছে। দেখ, শিখা, ঐ ছোঁড়াটাকে আমি কিছুতেই সহ্য করতে পারি না। কিছু বোঝে না, খালি তর্ক করে। [একটু হেসে] তুমি আর ওদের সামনে এসো না—কেমন ? তুমি ভেব না, আমি ওদের এ-বাড়িতে আসা বন্ধ করবই। যার কথায় ঘর দিয়েছিলাম সেই যখন নেই—

শিখা : না-না, তুমি কি বলছ ?

অভয় : বলছি ঠিকই। অনেক চক্রান্ত আছে এর মধ্যে। তুমি এর মধ্যে এসো না। আমিও এবার ঝুট-ঝামেলা কাটাব।

শিখা : তা হতে পারে না। তুমি আর আমায় এ অনুরোধ ক'র না।

অভয় : তুমি আমার বিবাহিতা স্ত্রী হ'য়ে একটা কথা রাখবে না ?

শিখা : না-না, আমি পারব না। ওদের না দেখে আমি থাকতে পারব না। তুমি আমার অনেক ক্ষতি করেছ, কিন্তু এ অনুরোধ ক'র না।

[শিখা ছুটে বেরিয়ে যায়। অভয় এক জায়গায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। বাইরের দরজায় শব্দ হয়]

অভয় : [চমকে] কে ? কে ?···ওঃ, অজয়, তুই !

[দীর্ঘনিশ্বাস]

॥ পর্দা ॥

॥ তৃতীয় অঙ্ক ॥

[পূর্বের দৃশ্য। ফুলদানিতে তাজা রজনীগন্ধা। আসবাব-পত্র সাজান-গোছান। দিনের আলোয় সব পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। পর্দা উঠতেই দেখা গেল অভয় টেবিলের ওপর কনুইয়ে ভর দিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। কিছুক্ষণ নিরব থাকার পর]

অভয় : [স্বগত] আমি যাকে একান্ত আপনার ক'রে পেতে চাই সে কেন দূরে সরে যেতে চায়···শিখা জানে না, আমি তাকে কত ভালবাসি !···তবে কি আমার—না-না। এবার আমি তাকে খোলাখুলি জিজ্ঞেস ক'রব—সে আমাকে চায় কি না ? তাকে না দেওয়ার মত আমার তো কিছুই নেই—তবে কেন সে আমায় অবজ্ঞা করে ? তারই জন্যে আজ···[প্রবেশ করে শিখা] এই যে, কি করছিলে ?

শিখা : সংসারের কাজ শেষ করলাম।

অভয় : তোমার বড় খাটুনি হ'চ্ছে, না ? আচ্ছা, রান্নার জন্য একজন লোক রাখলে কেমন হয় ?

শিখা : না, থাক।

অভয় : আচ্ছা, বাসন মাজাব লোকটা রোজ আসে তো ?

শিখা : হ্যাঁ, আসে।

অভয় : তা হ'লে একজন রাঁধবার লোক আমি দু'একদিনের মধ্যেই ঠিক ক'রে ফেলি—কি বল, এ্যাঁ ?

শিখা ঃ না, দরকার নেই।

অভয় ঃ না-না, তোমার বড্ড বেশি খাটুনি হ'চ্ছে। আমি দু'এক দিনেব মধ্যেই বন্দোবস্ত করছি— [শিখা চলে যাচ্ছিল] কোথায় যাচ্ছ ?

শিখা ঃ এই—কিছু কাজ পড়ে আছে তাই—

অভয় ঃ শুধু কাজ, কাজ, আর কাজ! তোমায় যখনই আমি ডাকি তখনই তোমার হাতে এসে পড়ে যত রাজ্যের কাজ। আচ্ছা, আমার কাছে আসাটা কি তোমাব কাজ নয় ?

শিখা ঃ এ প্রশ্ন কেন ?

অভয় ঃ এ প্রশ্ন আজকের নয়, শিখা। বহুদিনের ভুল বোঝার আবর্জনা আমাদের মনে স্তূপাকার হ'য়ে আছে। তাই সে আবর্জনা সাফ ক'রে মন হাল্কা ক'রতে চাই। তুমি জান না, এই দু'বছরের প্রতিটি দিন প্রতিটি মুহূর্ত আমার কি অশান্তিতেই না কাটছে। তোমায় যত কাছে পেতে চাই তুমি তত দূরে সরে যাও।

[নিরবে শিখা চলে যাচ্ছিল]

শোন, শিখা, তুমি এমনিভাবে চলে যেও না—বলে যাও। তুমি জান না, শিখা, জীবনে কোথাও আমি হার মানিনি; কিন্তু তুমি আসার পর থেকে যে অভয় একটা বিরাট মানুষ ছিল, যার ভয়ে অনেকেই কেঁপে উঠত, সে আজ হ'য়ে গেছে একান্ত অসহায়।

সমাজে মাথা তুলে দাঁড়াবার ক্ষমতা পর্যন্ত তার নেই। তুমি কি কখনও আমার কাছে কিছু চেয়ে খালি হাতে ফিরেছ ?

শিখা : আমি তো তোমার কাছে কিছুই চাই নি।

অভয় : তবে [নেপথ্যে ঢং ক'রে একটা ঘণ্টার আওয়াজ হয়। অভয় চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে ছট্‌ফট্‌ ক'রতে থাকে। শিখা অবাক হ'য়ে যায়।]

শিখা : কি হ'ল ? তুমি অমন ক'রছ কেন ?

অভয় : [সামলাবার চেষ্টা ক'রে] এঁ্যা—না—না। কিছু নয়। হ্যাঁ, তুমি যেন কি বলছিলে ?

শিখা : সেদিন রাত্রে ট্রেজারীর ঘড়িতে যখন একটার ঘণ্টা বাজল তুমি বিছানা থেকে উঠে ব'সে ছট্‌ফট্‌ করছিলে! কেন ? কি হ'য়েছে ? একটার সময়—

অভয় : রাত একটা! উঃ, কী সাংঘাতিক! না, কিছু নয়। আমার শরীরটা খুব খারাপ লাগছে।

[দ্রুত প্রস্থান। শিখা চুপ ক'রে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে। মঞ্চের আলো ক্রমশঃ নিভে আসে। বেশ কিছুক্ষণ কাটার পর—কারখানার ভেঁা শোনা গেল। একটু পরেই ফ্যাক্টরীর পোষাকে অজয় এবং খগেন প্রবেশ করে। তাদের সারা শরীরে সুতোর কুঁচো। গানের সুর ভাজতে ভাজতে ঢোকে।]

অজয় : বৌদি—এই যে। দাঁড়াও, আলোটা জ্বেলে দি। [অজয় আলোটা জ্বেলে জামা খুলতে খুলতে] জান বৌদি, আজ একটা কাণ্ড হ'য়েছে।

শিখা : আবার কি কাণ্ড হ'ল ?

অজয় : আমাদের সেই রাজারাম ছিল না—

শিখা : কে রাজারাম বলতো ?

অজয় : সেই যে খুব মোটা তাগড়াই চেহারা—

খগেন : আরে, তুমি যাকে বলেছিলে ক-কলিযুগের দ-দ-দৈত্য—

শিখা : ও, হ্যাঁ-হ্যাঁ। তার কি হ'য়েছে ?

অজয় : মেশিনের মধ্যে পড়ে তার ডান হাতটা একেবারে গুঁড়িয়ে গেছে।

শিখা : তারপর কি হ'ল ?

অজয় : আমরা একবার চেষ্টা করলাম মেশিন বন্ধ করে ম্যানেজারের কাছে যেতে। ওরে বাবা, সে কি অবস্থা ! ওরা যে কত সংগঠিত হ'য়েছে— আজ টের পেলাম।

খগেন : তবু তো আ-আমি এ-এগিয়ে গিয়েছিলাম। শালা কা-কাল্লু স-সর্দার বাঘের ম-মত তে-তেড়ে এল। ব-বলে কি জান ? জো শা-শালা শু-শুয়োর কি বাচ্চা আ-আভি উধার জায়গা উ-উনকো ঘাড় পা-পাকারকে নিকাল দেগা।

শিখা : তোমরা প্রতিবাদ ক'রলে না ?

অজয় : প্রতিবাদ !···ওটা অমরদা পকেটে ক'রে নিয়ে চলে গেছে।···জান, বৌদি, আজ আমাদের কি অবস্থা ? কেউ কাউকে বিশ্বাস ক'রতে পারছে না। যদি কেউ একটা ভাল কথা বলে, অমনি আশে-পাশে যারা থাকে ছুটে পালায়। আর যে ব'লতে যায় তার অবস্থা আরও শোচনীয়। ভাবতে শুরু ক'রে দেয়, সেই দিনই তার শেষ দিন। কেউ মুখ খুলতে সাহস করছে না।

খগেন : এই আ-আমারই তো সেই অ-অবস্থা হয়েছিল। ছুটির পরে এ-এ-একদল লোক এক জা-জায়গায় জটলা পা-পাকাচ্ছিল —আমি এগিয়ে গিয়ে বলার ম মধ্যে শুধু ব-বলেছিলাম রাজারাম কো-কোথায়—তাকে নিয়ে ম্যা-ম্যা-ম্যানেজারের কাছে যাব। যেই না বলা— স-সঙ্গে সঙ্গে কে-কেউ সেখানে নেই ! এ-এই হচ্ছে অবস্থা—।

অজয় : আমি ভেবে দেখিছি, বৌদি, আমাদের এখানে তিন ধরনের মজুর আছে। একদল যারা নেতার ওপর ভরসা রেখে নিশ্চিন্তে বাড়িতে ঘুমোয়। আর একদল আছে, যাদের চেষ্টাচরিত্র ক'রে একপা' হয়ত এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হ'ল, কিন্তু তিন পা পিছিয়ে যাবার জন্যে পা বাড়িয়ে থাকে—

খগেন : তা-তা-তাদের ইচ্ছেটা হচ্ছে তোমরা দা-দা-দাবি আদায় করে দাও, আমরা ভোগ করি।

অজয় : আর শেষের দলটা থাকে ঐ ব্যারাকে—যারা সংখ্যায় অনেক বেশি। ওরা নাম শুনলেই ছুরি চালায়।

খগেন : সে-সে-সেই সেবার মনে আছে, অজয়, আমি ওদের ব্য-ব্য-ব্য-ব্যারাকে গিয়ে বলেছিলাম ইউনিয়নের মে-মে-মে-মেম্বার হবার জন্যে, তারপর আমাকে এই মারে কি সেই মারে! শালা বংশী তো ছু-ছু-ছু-ছু-ছুরি চালাতে আসে। শেষে অমরদা আমায় বাঁচায়।

অজয় : মজুররা এখনো বলে বড়দাই নাকি ওদের সব বন্দোবস্ত করে দেবে। এতদিন ভরসা ছিল অমরদার ওপর—সে নেই, এখন বড়দাই ওদের আশা-ভরসা। আমার মনে হচ্ছে আমাদের সবচেয়ে বড় দুর্বলতা ঐ জায়গাটায়—আমরা নিজেদের ওপর যত না বিশ্বাস রাখি, তার চেয়ে অনেক বেশি আস্থা রাখি অন্যের ওপর। সে যদি বিশ্বাসঘাতকতা করে আমরা যাই ভেঙ্গে। তাকে যদি খুন করে, আমরা এমন মুষড়ে পড়ি যে উঠে দাঁড়াবার শক্তি থাকে না। কর্তৃপক্ষ আমাদের ভালভাবে চিনেছে, বৌদি।

খগেন : ঠিক বুঝিছিস, অজয়। এই আমি একদিন রামানন্দকে বললুম—মিটিংয়ে আয়। সবাই মিলে একসঙ্গে ডিসিসান নিতে হবে তো। সে-সে আমায় বলে কি তোরা আছিস কেন? অতো সময় আমার নেই। হুঁ, আমার নামও খগেন, আমিও বলেছি—আমরা

ল-লড়াই করব, দাবি আদায় ক'রে দেব, আর তোরা মদের বোতল নিয়ে ফূ-ফূফূর্তি করবি !…এখানে কিছু হবে না। সব বেটাকে আমি চিনেছি—শালারা সব সা-সা-স্বার্থপর।…অভয়দা কোথায়? দেখা করা দরকার।

শিখা : ভেতরে আছে, যাওনা।

খগেন : যাই, সমস্ত ব্যাপারটা বলে আসি। [প্রস্থান]

অজয় : এই খগেন-ভবেশ-নিতাই-আবদুল-সেলিম — এরা সংগঠনটাকে কত ভালবাসে। এরাই হচ্ছে জঙ্গী কর্মী। কিন্তু হলে কি হবে, কর্তৃপক্ষ আমাদের এমন ভাবে রেখেছে যে, আমরা কেউ কারুর সাথে কথা পর্যন্ত কইতে পারব না। তিনজন যেখানেই জড় হই সেখানে একজন থাকবেই মালিকের লোক।

শিখা : আচ্ছা, ঠাকুরপো, তোমরা ঐ ব্যারাকে যাওনা কেন? ঐখানেই তো ওদের বেশির ভাগ লোক থাকে।

অজয় : ওখানে থাকে কতকগুলো ভেড়া। হ্যাঁ, আমি ওদের ভেড়াই বলব। জান, বৌদি, ঐ গারদের মানুষগুলোকে কিসের নেশায় ভুলিয়ে রাখা হ'য়েছে?…তাড়ি-মদ-ভাঙ আর কতকগুলো বাজে মেয়েছেলে দিয়ে। ওদের কানে কেউ যাতে ভাল কথা না বলতে পারে তার জন্য সব সময় তিনটে ভাঙ্গা এম্‌প্লিফায়ার বাজান হয়। যে যত বড় গুণ্ডা তার ওখানে তত বেশি কদর।

তবে হ্যাঁ, ওখানেও অমরদা রোজ যেত। কেউ ওঁর গায় হাত তুলতে সাহস ক'রত না। জান, বৌদি, ওখানকার গুণ্ডারা যদি অমরদাকে খুন ক'রত তবে আমরা জানতে পারতাম। যদিও করার কিছুই থাকত না, তবে একটা সান্ত্বনা থাকত যে মালিকের পেটোয়া লোকে খুন করেছে—

[বাইরের দরজায় শব্দ হওয়ার সাথে সাথে অজয় তাকিয়ে দেখল সেলিম দাঁড়িয়ে আছে]

কি রে, ওখানে কেন? ভেতরে আয়।

সেলিম : বৌদি, তোমরা কি বিশ্বাস ক'ব, আগে বল—

[কেঁদে ফেলে]

চুপ ক'রে থেক না, বৌদি—অমরদাকে আমি মেরেছি? দাদাকে ভাই খুন ক'রবে, বৌদি?

[উচ্চস্বরে কেঁদে ওঠে]

অজয় : চুপ কর্, সেলিম। আমরা কেউই বিশ্বাস করিনি যে তুই খুন করেছিস্।

শিখা : কে বলেছে তোমায়?

সেলিম : আমি বাড়ি থেকে ফিরে এসে দেখি কেউ আমার সাথে কথা বলে না—আড়ালে ফিস্ ফিস্ করে—তাই তোমার কাছে এলাম। বল বৌদি, আমি তোমার ছেলের মত—আমি অমরদাকে খুন করেছি?

শিখা : চুপ কর, সেলিম।

অজয় : তুই ভয় পাচ্ছিস্ কেন ?

সেলিম : অজয়, এই মিথ্যে বদনামের চাইতে মৃত্যুও আমার কাছে অনেক ভাল রে !

অজয় : আমরা ভাবছি এটা মালিকের একটা চাল। অমরদাই বলেছিলেন, কারুর কথা শুনে প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত আমরা যেন কোনও কাজ না করি।

[খগেন ঢুকে সেলিমকে দেখেই চটে যায়]

খগেন : কি-কিরে, হা-হাতের রক্ত শুকিয়েছে ?

সেলিম : তার মানে ?

খগেন : মানে তু-তুই জানিস না, শা-শালা ? অমরদাকে খু-খুন ক'রে এ-এখন রোয়াব দে-দেখাচ্ছ— ? শু-শুয়োরের—

সেলিম : সামালকে বাত বল্। কোন্ শালা বলেছে আমি খুন করেছি ?

খগেন : কী, গা-গালাগালি—তবেবে শা-শালা নেড়ে—

[মারতে যায়—অজয় বাধা দেয়]

অজয় : কি হচ্ছে, খগেন ? তুই জানিস্ ও মেরেছে ?

খগেন : শালা—মে-মেরে একেবারে ত-তবলা খিঁচিয়ে দেব— । জানেনা আমার নাম খ-খগেন—

শিখা : খগেন, বাড়ি যাও। আমার বাড়িতে মারামারি ক'রতে এসেছ ? যাও বাড়ি যাও !

খগেন : ঠিক আছে, আমি যাচ্ছি। খু-খুব সা-সাবধানে রাস্তা চলবি, সেলিম। মনে থাকে যেন—

আমার নাম খগেন। [রেগে প্রস্থান]

সেলিম : দেখলেন তো বৌদি! ঐ খগেন আর আমি সেদিন একসঙ্গে সিনেমা দেখে বেরিয়েছি, আর আজ ও আমায় মারতে আসে! বলুন, এ বদনামের চাইতে আমার মরণ ভাল নয় কি? আমি মুসলমান বলেই হয়তো ওরা ধরেছে আমিই—[কেঁদে ফেলে] খুনী। কিন্তু ওরা জানেনা, দাঙ্গার সময়ে অমরদাকে আমার বাড়িতে রাখার জন্যে আমার বাড়ি পুড়িয়ে শেষ করে দিয়েছে! আমি পথে বসেছি!

[নেপথ্যে : "অভয় বাবু, বাড়ি আছেন?]

অজয় : ভেতরে আসুন! [প্রবেশ করে পুলিশ অফিসার]

অফি : অভয় বাবু আছেন?

শিখা : আছেন। একটু অসুস্থ হ'য়ে পড়েছেন ব'লে শুয়ে আছেন।

অফি : আমার নাম ক'রে একটু ডেকে দিন না।

শিখা : আচ্ছা। [প্রস্থান]

অফি : [সেলিমের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে] তোমার নাম?

সেলিম : সেলিম।

অফি : হুঁ। আচ্ছা, তুমি যেন কোথায় গিয়েছিলে?

সেলিম : আমার বাড়ি। বনগাঁয়।

অফি : কবে ফিরে এলে?

সেলিম : আজ সকালে।

অফি : কবে গিয়েছিলে ?

সেলিম : শনিবাব ভোব পাঁচটায়।

অফি : শনিবাব ভোব পাঁচটা ! আচ্ছা, অমববাবুব খুন সম্বন্ধে তুমি কিছু জান ?

সেলিম : আঁজ্ঞে না।

অফি : কিছুই জান না ?

সেলিম : এইটুকু জানি যে শনিবাব বাত্রে তাঁকে খুন কবা হ'য়েছে।

অফি : কি দিয়ে মেবেছে ?

সেলিম : গুলি ক'বে।

অফি : তুমি দেখেছিলে নিশ্চযই ?

সেলিম : আঁজ্ঞে না। আমি আজ সকালে ফিবে এসে শুনেছি।

অফি : হাঁ। ঠিক আছে।

[বিষণ্ন বদনে অভযের প্রবেশ। দেখলেই অসুস্থ মনে হয।] নমস্কাব, অভয়বাবু।

অভয় : নমস্কার।

অফি : আপনাকে অত্যন্ত অসুস্থ ব'লে মনে হ'চ্ছে !

অভয় : হ্যাঁ। শবীরটা আজ কদিন ধরে খুবই খারাপ যাচ্ছে। তারপব সেলিম, কবে এলে ?

অফি : সেলিমেব সাথে একটু কথা বলে নিলাম।

অভয় : ওঃ। তারপর কি খবর ?

সেলিম : অভয়দা, আপনাদের কাছেই আমি মানুষ হ'য়েছি। আপনার কি ধারনা আমিই অমরদাকে খুন করেছি? বলুন, অভয়দা, আপনার পায়ে পড়ি। আপনি আমার দাদার মত—বলুন, আমি মেরেছি? [পা জড়িয়ে ধরে]

অভয় : আঃ—ওঠো। [ধুক্‌তে ধুক্‌তে] তোমায় কি কেউ সেকথা বলেছে? তবে অফিসারবাবু সবাইকেই জিজ্ঞেস ক'রছেন—তোমার কাছ থেকেও জেনে নিলেন। এইতো আমার বাড়ি এসেছেন খবর জান্‌তে।···অজয়, তোমার বৌদিকে বল চায়ের বন্দোবস্ত ক'রতে, আর সিগারেটের প্যাকেটটা পাঠিয়ে দাও।

অজয় : আচ্ছা। [প্রস্থান]

অভয় : তাহ'লে, সেলিম, তুমি এখন বাড়ি যাও—স্নান-টান করো। ওসব কথা ভেবে আর কোন লাভ নেই। যে যাবার সে চলে গেছে। তাকে তো আর ফিরে পাব না, ভাই! কে মারল তাতে আর কি এসে যায় বল। আমরা আমাদের অমূল্য সম্পদ হারিয়েছি।

সেলিম : এর চাইতে আমাকে যদি খুন ক'রত তাহ'লে ভাল হ'ত, অভয়দা। [আবার কাঁদে]

অভয় : কেঁদোনা, ভাই, কেঁদোনা। তোমাকেই বা আর কি বলব! আজ চারদিন বিছানা ছেড়ে উঠতে পারি নি। সত্যি, সে যে আমাদের হৃদয়ে কতখানি জুড়ে ছিল আজ বুঝতে পারছি। যাও ভাই, বাড়ি যাও। [দীর্ঘনিশ্বাস

ফেলে চোখ মোছে। সেলিমের প্রস্থান। একদিক দিয়ে অজয় চা নিয়ে ঢোকে অন্যদিক দিয়ে রবির প্রবেশ]

চা নিন। ওঃ, রবি! অজয়, আর এক কাপ চা নিয়ে আয়।

রবি : এই যে, আপনিও আছেন দেখছি? আচ্ছা, আপনারা এরকম ইরেসপন্সিবল্ লোকের মত কথা বলেন কেন?

অফি : কেন?

রবি : কোন ডকুমেণ্ট পেলেন না, কিছু না, অথচ একজন ইন্নোসেন্ট্ লোকের নামে দোষ চাপিয়ে দিলেন—যেন সেই গিল্টা!

অফি : কই, আমরা তো কাউকে গিল্টী ব'লে এ্যারেষ্ট করি নি!

রবি : অথচ বাজারে রাষ্ট্র হয়ে গেছে যে, পুলিশ থেকে বলেছে—সেলিম খুনী। আমি বুঝতে পারি না এই ব্যারাকে পঞ্চাশ জন নামকরা গুণ্ডা থাকা সত্যেও সেলিমের নাম কি ক'রে অনুমানে ধরা গেল! আপনারা জানেন গত দাঙ্গার সময়ে অমরদা সেলিমের আশ্রয়ে ছিলেন?

অফি : তাতে কি হ'য়েছে? মানুষ পাল্টাতে কতক্ষণ লাগে?

রবি : কিন্তু সেলিমের জীবনে এর মধ্যে এমন কোনও ঘটনা ঘটেনি যাতে সে পাল্টে যেতে পারে।

[অজয় আর এককাপ চা নিয়ে ঢোকে]

অভয় : রবি, চা নাও। তুমি খুব চটে গেছ—মাথা ঠাণ্ডা কর।

রবি : আপনি বুঝতে পারছেন না, অভয়দা, সে বেচারীর কি অবস্থা হয়েছে।

অফি : দেখুন, এসব ব্যাপারে কোন সেন্টিমেণ্ট নিয়ে কাজ চলে না। যাক, তর্ক করে লাভ নেই। অভয়বাবু, আপনাকে একবার থানায় যেতে হবে যে।

অভয় : আমার শরীরটা আজ খুবই খারাপ—কাল গেলে হয় না?

অফি : আরে, মশাই, যাবেন তো আমার গাড়িতে। বিকেলের হাওয়া খাওয়ার কাজটা হ'য়ে যাবে।

অভয় : তবে চলুন। রবি, তোমার সাথে তো আজ আর কথা বলতে পারছি না, ভাই। তুমি কাল একবার এসো। …এখানে থেকে এখন আর কি ক'রবে—চলো না তোমায় গাড়ি করে পৌঁছে দিয়ে যাব।

রবি : হ্যাঁ, তাই চলুন।

অভয় : শিখা, আমি একটু বেরুচ্ছি।…চলুন।

[অভয় আর অফিসারের প্রস্থান। শিখা দৌড়ে এসে রবির জামা ধরে টান মারল]

শিখা : রবি!

রবি : অভয়দা, আমি একমিনিটের মধ্যে আসছি। ব'ল।

শিখা : [ইশারায় কাছে ডেকে] আমার একটা কথা রাখবে?

রবি : হুঁ, যদি বাখার মত হয়।

শিখা : একটু স্যাক্রিফাইস্ ক'রতে হবে

রবি : কি? লাইফ?

শিখা : [হেসে] না।

রবি : তবে, অর্থ?

শিখা : হ্যাঁ।

রবি : কত?

শিখা : সামান্য।

রবি : উহু—একটু পরিষ্কার ক'বে বল। তোমার কাছে যা সামান্য আমার কাছে তা অসামান্যও হ'তে পারে। [হাসে]

শিখা : কেন?

রবি : তোমার গলার হারটার যা দাম তা আমায় বেচলেও পাওয়া যাবে না। [দুজনেই হো-হো করে হাসে]

শিখা : না-না, এমন কিছু নয়।

[নেপথ্যে : রবি, শীগ্গিব এসো]

রবি : যাচ্ছি, অভয়দা। [চাপাস্বরে] তাড়াতাড়ি বল। [পেছনে তাকিয়ে দেখে] ওদিকে তোমার ইয়ে আবার ভাবছে, ফুস্লে নিয়ে পালাচ্ছি।

শিখা : কাল দুপুর বেলা ছুটি নিয়ে একবার নিশ্চয়ই আসছ।

রবি : ছুটি নিয়ে কেন?

শিখা : যা বলি, শোন। ভুল যেন না হয়। অনেক কথা

আছে। সেবারের মত ভুলে গেলে কিন্তু খুব খারাপ হবে।

[দরজা খুলে প্রবেশ করে অভয়]

অভয় : [ওদের তুজনের আলাপ দেখে চটে গেল। নিজেকে সামলে নিয়ে] ওঃ, শিখা বুঝি তোমায় জমিয়েছে?

রবি : আর বলেন কেন! আজ কারখানায় একটা কাণ্ড হয়েছে কি না—তাই নিয়ে, শিখা…

অভয় : ওঃ, হ্যা হ্যা—শুনেছি বটে।

রবি : শুনেছেন? দেখুন দেখি, শত্রু আমাদের কিভাবে পিষে মারতে চাইছে! আমি বলি কি, স্ট্রাইকের ব্যাপারটা—

অভয় : দেখ, রবি, তোমরা একেবারে ছেলেমানুষ। হট্ ক'রে একটা ডিসিশন্ নিলেই হ'ল! আমি তো তোমাদের বার বার বলেছি যে এখন ওসব কিছু হ'তে পারে না।

রবি : কিন্তু সবাই তো সই করেছে! আপনি কি ব'লছেন?

অভয় : থামো। তিন দিন রাজনীতি ক'রে তুমি এরি মধ্যে সব জেনে ফেলেছ? দেখ, আমি ইউনিয়নের প্রেসি-ডেণ্ট—সব সময় আমার ওপর কর্তাগিরি ফলাতে এসো না।

রবি : আপনি একটা কমিটি-মিটিং ডাকার ব্যবস্থা করুন। আমার মনে হ'চ্ছে, আন্দোলনের সম্ভাবনাকে চেপে দেওয়া হ'চ্ছে—

অভয় ঃ চুপ কর। আমাকে যদি তোমাদের এতই অবিশ্বাস তবে যা ইচ্ছে করগে। আমি ওসবের মধ্যে নেই। আর আমার ঘর থেকে ইউনিয়নের অফিস তুলে নিয়ে যাবে। কোন ফ্যাসিলিটি আর আমার কাছে পাবে না।

শিখা ঃ না। কেন নিয়ে যাবে?

অভয় ঃ [তাকিয়ে দেখে] না-না, আমি তা বলছি না। আচ্ছা, অনর্থক তর্ক ক'রে আমার মাথা গরম ক'রে দাও কেন বলত? চলো, এখন আমার কথা বলার সময় নেই। দেখ, আমাদের সামনে একটা বিরাট প্রশ্ন রয়েছে—কে অমরকে খুন ক'রল?

[বল্‌তে বল্‌তে প্রস্থান]

শিখা ঃ [ইশারায়] আসছো?

[রবি ঘাড় নেড়ে বেরিয়ে যায়। শিখা মুখে হাত দিয়ে মুচকি হাসছিল]

॥ পর্দা ॥

॥ চতুর্থ অঙ্ক ॥

[একই দৃশ্য। সময় : দিন। শিখা খুব ব্যস্ত। চেয়ার-টেবিলগুলো ভাল ক'রে সাজিয়ে রাখছে। শিখাকে আজ সুন্দর পোষাকে অপূর্ব লাগছে দেখতে। কার জন্য যেন অধীর অপেক্ষায় চঞ্চল হ'যে উঠেছে]

শিখা : [একবার ঘরের বাইবে গিয়ে আবার ফিরে এল] এখনো এল না ?

[দ্রুত পাইচারি কবে। বাইরে কিসের শব্দ হয়]

ঐ এসেছে—আজ এমন মজা দেখাব, টের পাবে! [ছুটে বাইরের দরজায় উঁকি মেরে দেখে] না! [ঘড়ির দিকে তাকিয়ে] এদের কথার কোন দাম নেই!

[হাসি মুখে রবির প্রবেশ]

রবি : কাদের কথার দাম নেই ?

শিখা : [রবিকে দেখে কিছু বলতে গিয়ে বলতে না পেরে শুধু মুখ দিয়ে বেরুল] রবি!

রবি : কেন ? সন্দেহ হচ্ছিল বুঝি, আমি আসব না ?

শিখা : তোমাদের তো আর গুণের ঘাট নেই—এত দেরি করলে কেন ?

রবি : সূতোকলের মালিক তো আর আমার শ্বশুর মশাই নয়!

শিখা : কেন ? সেদিকেও ঝোঁক আছে নাকি ?

রবি : চেষ্টা কবছি। হ'লে মন্দ হয় না—কি বল ?

শিখা : বৃথা চেষ্টা করছ।

রবি : তবে অন্য জায়গায় চেষ্টা ক'রতে ব'লছ ?

শিখা : [অভিমানে] থাক্, হ'য়েছে।

ববি : কি হ'ল ?

শিখা : বাজে বকোনা ? [দূরে গিয়ে গুম হ'য়ে বসে]

রবি : ও, বুঝেছি !

শিখা : কি বুঝেছ ?

রবি : এই—মেয়েরা বড় বেশি সেন্টিমেণ্টাল ! পান থেকে চুন খসলেই বাস্—অমনি অভিমান ! আর সে অভিমান ভাঙ্গতে আধ মণ সবষের তেল আর—

শিখা : খুব হ'য়েছে ! ছেলেরা যে কত কাজেব আমার জানতে বাকি নেই !

রবি : তার মানে ?

শিখা : কেন ? বুঝতে পারলে না ?

রবি : না।

শিখা : নাকে দড়ি দিয়ে না টানলে বুঝি মাথায় ঢোকে না ?

রবি : তুমি কি বলতে চাও আমি বুঝ্তে পাবছি না !

শিখা : বুঝলে না ? এবার আমি একটা কথা বলি।

রবি : বল।

শিখা : ছেলেরা মেয়ের সামনে এলেই বোকা বনে যায়।

[হো-হো করে হেসে ওঠে। রবি লজ্জা পায়]

একি, কান লাল হ'য়ে গেল যে ?

ববি : এ্যাঁ, না না থাক, ওসব কথা ছেড়ে দাও! আসল কথাটা বল দেখি ?

শিখা : সবুরে মেওয়া ফলে—দাঁড়াও, বাইবের দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে আসি। [দরজা বন্ধ করে আসে] এইবার তোমাতে-আমাতে বোঝাপড়া হবে।

রবি : মা-নে, মা—মারধোর ক'রবে না কি ?

শিখা : তোমরা তা হ'লে মেয়েদেবও ভয় কর ?

রবি : ভয় ? কি বলছ ? পুবপুরুষকে ঘরে ডেকে এনে দরজা বন্ধ ক'রে দেওয়া সিরিয়াস কেস্!

শিখা : তাই নাকি ? তা'হলে জেনে রাখ এবার আমি সত্যিই সিরিয়াস্! আচ্ছা রবি ?

রবি : দাঁড়াও, একটা বই নিয়ে আসি [উঠে গিয়ে একখানা বই নিয়ে আসে] বলে যাও—

শিখা : আমার সম্বন্ধে তোমার ধারনা কি, বলতে পার ?

রবি : ভাল! খুব ভাল! তুমি খুব ভাল মেয়ে!

শিখা : আর ?

রবি : তোমার পতি প্রেম অনুকরনীয়। সতী সাবিত্রী যমরাজের কাছ থেকে সত্যবানের জীবন ফিরিয়ে এনেছিল—

শিখা ঃ থাক্! [কি বলতে গিয়ে বলতে পারে না। প্রাণের কামনা ও আকাজ্ক্ষা চাপতে গিয়ে রবির চুলের মধ্যে আঙুল চালাতে থাকে]

রবি ঃ কি হ'ল? চুপ ক'রে গেলে কেন?

শিখা ঃ তুমি যেভাবে জবাব দিচ্ছ তাতে কথা ব'লে আর লাভ কি?

রবি ঃ [কি বলবে ঠিক ক'রতে না পেরে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে] মানে—শিখা, আমি চলে যাই!

শিখা ঃ কেন?

রবি ঃ বেআইনী প্রেমালাপ আমার শোভা পায়না, শিখা!

শিখা ঃ কেন তুমি আইনসঙ্গত ক'রে নিচ্ছ না? [সপ্রেম দৃষ্টিতে] তুমি জাননা, রবি, আমি প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে শুধু তোমারই কথা ভাবি। আমার হৃদয়ে তুমি ছাড়া আর কিছু নেই। বল, কবে তোমাকে একান্ত আপনার ক'রে পাব?

রবি ঃ তুমি ভুলে যাচ্ছ, শিখা, তুমি পরস্ত্রী! তার বংশ রক্ষা করার দায়িত্ব তোমার ওপর!

শিখা ঃ সে সম্ভাবনা নেই!

রবি ঃ এ্যাঁ? কি ব'লছ?

শিখা ঃ হ্যাঁ। তা যদি থাকত তবে তুমি হয়তো আমার হৃদয়ে স্থান পেতে না! জীবনের এই ২৭ বছর কোন কাজেই লাগল না।

রবি : সত্যি ?

শিখা : হ্যাঁ। বল, আমাকে এই সোনার পিঞ্জর থেকে উদ্ধার করবে ? বল, চুপ ক'রে থেক না।

রবি : উদয়াস্ত হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করি—বুঝেছি শুধু ইউনিয়ন আর সংগঠন। এর কোন ফাঁকে তুমি যে আমার মনে কি বিরাট স্থান অধিকার ক'রে ব'সেছ তা তুমি জান না, শিখা। শুধু সমাজের দিকে তাকিয়ে আমি তোমাকে ভুলবার চেষ্টা করেছি, আর দিনের পর দিন তোমাকে এড়িয়ে চলেছি। সেই ছাই-চাপা আগুনকে তুমি খুঁচিয়ে উস্‌কে দিলে কেন ?

শিখা : সমাজের স্বার্থে তোমরা আত্মপীড়ন ক'রতে পার ; কিন্তু সমাজের নিয়মে কি একথা বলে যে একজন যুবতী তার যৌবনকে ভুলে একটা অসুস্থ মানুষের সঙ্গে সোনার খাঁচায় বাঁধা থাকবে—আর তোমরা, সমাজসেবীরা, কেবল ফাঁকা স্ত্রী-স্বাধীনতার বুলি আউড়ে যাবে ! মানুষ তোমার কাছে তৃষ্ণার জল চাইছে আর তোমরা তাকে শোনাচ্ছ জলের উপকারিতা সম্বন্ধে বক্তৃতা !

রবি : সবই বুঝি, শিখা, কিন্তু উপায় কি ?

শিখা : চল, রবি, আমরা এখান থেকে চলে যাই। আমরা গড়ব একটা নতুন সংসার—

রবি : না, তা হয় না, শিখা। তুমি জান, আজ যদি তোমায় নিয়ে আমি এখান থেকে চলে যাই তার ফল কি

দাঁড়াবে? এখানকার সংগঠন ভেঙ্গে চূরমার হ'য়ে যাবে। একটা রবির ব্যক্তিগত সুখের জন্য এতগুলো মানুষের এই সংগঠন ভেঙ্গে যাবে। না-না, শিখা, তুমি আমায় ক্ষমা কর। [কাতর ভাবে] আমার ব্যক্তিগত আশা আকাঙ্ক্ষাকে আমি সকলের সাথে মিলিয়ে দিয়েছি। তাই মাঝে মাঝে নিজের সত্তাকে খুঁজে পাইনা।

শিখা : কিন্তু আমি—

রবি : তুমি জান না—অভয়দাকে দুঃখ দিতে চাই না, তাই নিজের কামনাকে দিয়েছি বলি।

শিখা : [হতাশায় ভেঙ্গে পড়ে] রবি, তুমি—[আর বলতে পারল না—শুধু ফ্যাল-ফ্যাল ক'রে রবির দিকে তাকিয়ে রইল। রবি মন্ত্রমুগ্ধের মত এগিয়ে যেতে-যেতে থমকে দাঁড়াল। তার শরীর কাঁপছে উত্তেজনায়।]

রবি : না-না, একি করছি আমি! যাই, শিখা, আমি যাই—

[ছুটে বেরিয়ে গেল। শিখা অবসন্ন দেহে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে রইল। একটু পরে প্রবেশ করে অভয়। শিখার সাজের দিকে তার নজর পড়ে।]

অভয় : শিখা, আজ তোমায় অপূর্ব লাগছে। এ সাজে তোমায় কতদিন দেখিনি !

শিখা : [নিজেকে সামলে, যান্ত্রিক হাসি হেসে] কেন? খুব খারাপ লাগছে?

অভয় ঃ তোমার সৌন্দর্যে আজ প্রকৃতিকেও হার মানিয়েছ—
তোমায় দেখে মনে পড়ছে আজ কবিতা—হ্যাঁ,
কবিতা—শুনবে ? শোন—
আজ কোনও কাজ নয়। সব ফেলে দিয়ে
ছন্দোবন্ধগ্রন্থগীত, এসো তুমি প্রিয়ে
আজন্ম-সাধন-ধন সুন্দরী আমার
কবিতা, কল্পনা-লতা। শুধু একবার
কাছে বসো। আজ শুধু কূজন গুঞ্জন
তোমাতে আমাতে, শুধু নীরবে ভুঞ্জন
এই সন্ধ্যা-কিরণের সুবর্ণ মদিরা—
[শিখা অনেক কষ্টে বসেছিল—এবার উঠে যেতেই
অভয় থেমে যায়।]
ও, তোমাব ভাল লাগছে না! তা, বললেই হয়।
শুনলে, কী সুন্দর কবিতাটা! আজ তোমায় একটা
ভাল খবর শোনাব, শিখা। আজ আমি কাজে
প্রমোশন পেলাম তোমার ঈশ্বরের কৃপায়। এবার
থেকে ৭০০৲ টাকা মাইনে পাব।

শিখা ঃ সা—ত শো টাকা ?

অভয় ঃ হ্যাঁ, পাঁচশো থেকে একেবারে সাতশো। ভাবছি, এবার
একটা গাড়ি কিনব। তুমি ড্রাইভিংটা শিখে
নেবে—

শিখা ঃ হ্যাঁ—কেন শিখব না ?

রবি : তা'হলে গাড়িটা কিনে ফেলি, কি বল?

শিখা : জান, আজ শুক্রবার। একটা সপ্তাহ পার হ'তে চলল। গত শুক্রবার অমরদা এই সময় এখানেই ছিলেন—

অভয় : এ্যাঁ—হ্যাঁ, সে তো নিশ্চয়ই—

শিখা : আর শনিবার রাত একটায়—

অভয় : এ্যাঁ [আঁতকে উঠল] রাত এ-ক-টা—উঃ—
[মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ে]

শিখা : কি হ'ল?

অভয় : এ্যাঁ? না-না—কিছু না—কিছু না—

শিখা : বলনা, রাত একটার সময় কি হ'য়েছে?

অভয় : [বিভ্রান্ত হ'য়ে] না—কিছু নয়! ও কিছু নয়!

শিখা : তুমি এত বিচলিত হ'য়ে পড়েছ কেন?

অভয় : এ্যাঁ—বি-চ-লিত?

শিখা : ওগো, বলনা? কি হ'য়েছে? তোমায় এর আগে তো কোনদিন এমন ক'রতে দেখিনি! আজকাল রোজ রাত্রে তুমি স্বপ্নে চিৎকার ক'রে ওঠ! বলনা, কি হ'য়েছে—?

অভয় : [সামলে নিয়ে] তুমি কি ব'লছ? স্বপ্ন দেখে আমি কি বলেছি না বলেছি—আর তুমি তাকে সত্যি বলে ধ'রে নিয়েছ? তুমি ভেবেছ আমি বোধ হয়—

শিখা : তবে রাত একটা শুনলে এত আঁতকে ওঠ কেন?

অভয় ঃ [একটু ভেবে] তুমি জাননা—ওর পেছনে একটা ইতিহাস আছে।

শিখা ঃ কি ?

অভয় ঃ বছর সাতেক আগে একবার সাধারণ ধর্মঘটের ডাক পড়ল—হাট-বাজার, কল-কারখানা সব বন্ধ থাকবে। আমরাও ঠিক করলাম আমাদের কারখানায় ধর্মঘট সফল ক'রব। মালিকের নজর পড়ল আমার ওপর। হরতালের আগের দিন রাত একটা [গলা কেঁপে গেল] হ্যাঁ, রাত একটার সময় পুলিশ এসে দরজায় ধাক্কা দিল। অমর বলল—পালাতে হবে। আজ যদি ধরে নিয়ে যায় তবে কালকের হরতালের সমস্ত পরিকল্পনা মাটি হবে। আমি তো অবাক—পুলিশের চোখে ধূলো দেব! অমর আমার হাত ধর টেনে নিয়ে গেল। তারপরে পেছনের গোপন দরজা দিয়ে আমরা পালিয়ে গেলাম [আবার অন্যমনস্ক হ'য়ে পড়ে] আমার—আমার মাথাটা কেমন ক'রছে—আমায় একটু জল দাও।

শিখা ঃ এক্ষুনি আনছি [প্রস্থান]

অভয় ঃ আমি এসব কি বেফাস কথা বলছি! আমি সমস্ত কথাগুলোকে ঠিক গুছিয়ে ব'লতে পারছি না !···একি? কি হ'ল ?

[শিখা একগ্লাশ জল হাতে প্রবেশ করে]

শিখা : এই নাও।

[অভয় জল নিয়ে তাড়াতাড়ি কিছুটা মাথায় ও মুখে ছিটিয়ে দিল। বাকিটা ঢক্‌-ঢক্‌ ক'রে গিলে ফেলল। তারপর কাপড়ের খুঁটে মুখটা ভাল ক'রে মুছতে লাগল। শিখা জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে]

তোমায় একটা রুমাল দিয়েছিলাম সেদিন—কি হ'ল ?

অভয় : রুমাল ? কবে দিয়েছিলে ? মনে পড়ছে না তো !

শিখা : বারে—আমার সেই হাতের কাজ করা রুমালটা দিলাম—এরি মধ্যে হারিয়ে ফেলেছ ?

অভয় : না-না। কবে দিয়েছিলে ?

শিখা : গত শনিবার।

[অভয়ের পুরোন-স্মৃতি মনে পড়ে যায়। আবার ছটফট্‌ সুরু করে। বারে-বারে নিজের হাতের চেটের দিকে তাকায়। ক্রমশঃ তার মুখের রং পাল্টাতে থাকে।

বারে—আমার অত সুন্দর রুমালটা হারালে ! ওটা আমার প্রেজেণ্টেশনের রুমাল—

[অভয় ভীষণ অস্থির হ'য়ে ওঠে। আবার ঢং ক'রে একটা ঘণ্টা বেজে উঠল। অভয়ের চঞ্চলতা আরো বেড়ে গেল। শিখা অবাক হ'য়ে তাকিয়ে থাকে]

শিখা : কি হ'ল তোমার ?

অভয় : না, কিছু হয়নি। ভাবছি, আমাকে এত সন্দেহের চক্ষে দেখ কেন ?

শিখা : কাপড়ের খুঁটে মুখ মুছছিলে—তাই জিজ্ঞেস করলাম। এর মধ্যে সন্দেহের কি আছে ? তবে, তুমি দিন-দিন যে ভাবে চলাফেরা ক'রছ তাতে সত্যিই সন্দেহ হয় এবং তা দিন-দিন বাড়ছে—

অভয় : এ্যাঁ ? তুমি— তুমি···

[হঠাৎ কি ভাবে। ছুটে বাইরের দরজা দিয়ে বেরিয়ে যায়। শিখা একদৃষ্টে সেদিকে তাকিয়ে থাকে।]

॥ পর্দা ॥

॥ পঞ্চম অঙ্ক ॥

[পূর্বের দৃশ্য। পর্দা উঠতে দেখা গেল শিখা জানালার পর্দা সরিয়ে বাহিরের দিকে তাকিয়ে আছে। আকাশটা লাল, জানালার ভেতব থেকে বাইরেটা বড সুন্দর দেখাচ্ছে। রবি প্রবেশ কবে]

রবি : [বিভ্রান্ত] শিখা—

শিখা : কে ?···ও রবি !

রবি : ওখানে দাঁড়িয়ে কি দেখছ ?

শিখা : দেখবে এসো, রবি—আকাশের রংটা কেমন সুন্দর !

রবি : সত্যি, বড সুন্দর। কিন্তু আজ আমার চোখে আর কিছুই ভাল লাগছে না। কেন জান, শিখা ?

শিখা : কেন ?

রবি : তোমার রূপ আমাকে পাগল ক'রেছে শিখা—আমি কি ক'রব বলতে পাব— ?

শিখা : কি ক'রবে ?

রবি : আমার অন্তর জ্বলে পুড়ে খাক্ হ'য়ে যাচ্ছে। আমি কোনও কাজে মন দিতে পারছি না। সংগঠনের হাজার দায়িত্বপূর্ণ কাজ এক মুহূর্তের জন্যও তোমাকে আমার মন থেকে সরাতে পারছে না—তোমার স্থান সবার আগে। তাই সব কাজ ফেলে ছুটে এসেছি তোমার কাছে। কোন কর্তব্য কাজই আমাকে ধরে রাখতে পারল না—

শিখা : আমার প্রতি তোমার কোন কর্তব্য নেই ?

রবি : না-না, তা বলছি না। তোমার আত্মদান আমাকে উন্মাদ করেছে, শিখা। সংস্কার ব'লছে—এ অন্যায় ; —কিন্তু আমার বিবেক ব'লছে, না, এ অন্যায় নয়, এতে কোন দোষ নেই। আমরা সুখী হব---তোমায় নিয়ে নতুন করে ঘর বাঁধব—এই ভেঙ্গে-পড়া, ঘুণে-ধরা সমাজের কোন অনুশাসন আমি মানব না। কিন্তু আমার স্বপ্ন বোধহয় সফল হবে না—অনেক বাধা।

শিখা : কিন্তু আমাদের জীবনটা তো কাঁচের ঠুন্‌কো খেলনা নয় যে সামান্য আঘাতেই ভেঙ্গে পড়বে।

রবি : আমি আমার যুক্তি হারিয়ে ফেলছি, শিখা। আমি দিশেহারা হ'য়ে পড়েছি। না, আর ভাবতে পাচ্ছি না। ...জান, শিখা, তোমার সাথে মেলামেশার আজই বোধহয় শেষ দিন...

শিখা : কেন ?

রবি : অভয়দা এ বাড়িতে আসতে আমাদের বারণ করেছেন। বিশেষ ক'রে, আমি যেন আর একদিনও এখানে না আসি—তাই তিনি চান।

শিখা : তোমার আমার সম্পর্কটা সম্বন্ধে সে সন্দেহ করে ?

রবি : জানি না—তবে আমার এখানে আসা সম্পর্কে তাঁর আপত্তি জানালেন। তিনি পরিষ্কার বলেছিলেন, তুমি

আমাব বাড়িতে আসবে না।···আমাকে তিনি গোড়া থেকেই সইতে পারেন না।

শিখা : আমিও তার পরিবর্তন লক্ষ্য ক'রেছি।

রবি : হওয়াটাই স্বাভাবিক। হঠাৎ এত বড় একটা প্রমোশন পেলেন!

শিখা : প্রমোশন, হুঁ! তুমি জান, আমাকেও সে তোমাদের সামনে বেরুতে বাবণ কবেছে—আমাব দু'বছরেব বিবাহিত জীবন যে কী ক'বে কেটেছে তা কাউকে বোঝাতে পারব না—তিক্ততার শেষ সীমায় পৌঁছে গেছি। প্রতি মুহূর্তে সন্দেহ, ব্যর্থ লালসা আর টাকার লোভ ওঁকে পাগল ক'বে দিয়েছে, রবি। আমিও পাগল হ'য়ে গেছি।

রবি : অমরদার মৃত্যুর পব থেকেই তিনি সবাইকে সন্দেহ ক'রতে সুরু করেছেন। সামান্য কথাতেই উত্তেজিত হ'য়ে ওঠেন—কথায় কথায় চমকে ওঠেন—!···আমিও যাই, শিখা, আর এখানে থাকা উচিত হবে না।

শিখা : কোথায় যাবে?

রবি : যেদিকে মন যেতে চায়।

শিখা : একটা গল্প শুনবে, রবি?

রবি : গল্প?

শিখা : হ্যাঁ, একটা মেয়ের জীবনের কাহিনী। যৌবনের প্রথম দোরগোড়ায় যেদিন সে পদার্পণ ক'রল সেই দিন তার

অদৃষ্টে ঘটল মালাবদল। আর পাঁচজনের মত তারও ছিল কাব্যরোগ, স্বপ্নের পাখায় ভর দিয়ে মন তার যেতে চাইত উধাও হয়ে; কিন্তু বন্দিনী সে ছোট এক দোকানের গণ্ডিতে, স্বামী তার স্থূল প্রকৃতির কাঠখোট্টা মানুষ। ব্যবসা ছাড়া আর কোন কথা নেই মুখে। দোকানের টাকার হিসেব নিয়েই ব্যস্ত সারাদিন। এদিকে উপেক্ষিতা বধুর দিন কাটে আত্মরোমন্থনে, কল্পনার পাখায় ভর করে রহস্য নিবিড় জ্যোৎস্না রাতের স্বপ্ন দেখে। স্বপ্ন দেখে তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে কারু হাত ধরে নিরুদ্দেশ যাত্রার। স্বপ্ন, শুধুই স্বপ্ন !

রবি : থাক, শিখা—

শিখা : এমনি সময়ে সেই দোকানে এল এক তরুণ—

রবি : ওরা দুজনে দুজনকে ভালবাসল, ক্ষণিকের মিতালীর পরশকামনায় ওরা ব্যাকুল হয়ে উঠল! না—না, আমি যাই। [যেতে উদ্যত, পুনরায় ঘুরে এসে] শোন, শিখা, হয়তো আমাদের আর দেখা হবে না। [পকেট থেকে কাগজে মোড়া একটা প্যাকেট বার ক'রে এগিয়ে গিয়ে শিখার হাতে দিতে যায়] তোমার প্রেমে মুগ্ধ হয়ে আমার এই ক্ষুদ্র উপহার।

শিখা : রবি। [রবির হাতটা চেপে ধরে। দুজনে উত্তেজনার শেষপর্যায়ে পৌঁছে পরস্পরের চোখের দিকে ফ্যাল-ফ্যাল

ক'রে তাকিয়ে থাকে। বাইরে একটা শব্দ হ'ল—হঠাৎ দুজনের হাত ছেড়ে দিয়ে পরস্পরের কাছ থেকে সরে গেল।]

রবি : না-না, আমি যাই, আমি যাই, শিখা। [টেবিলের ওপর প্যাকেটটা রেখে দ্রুত প্রস্থান। শিখা স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইল। চোখের দৃষ্টি তার বিভ্রান্ত। কিছুক্ষণ পরে প্রায় টলতে-টলতে পেছনের দরজার দিকে এগুল। একটু পরে বাইরের দরজা খোলার শব্দ হ'ল—শিখার কানে গেল না। দড়াম ক'রে দরজা খুলে অভয় প্রবেশ ক'রল। শিখা একবার চোখ তুলে তাকাল শুধু, কিন্তু কোন কথা বলল না। অভয় হাঁপাচ্ছে, তার আর এগোবার শক্তি নেই। দরজাটা বন্ধ ক'রে তাতে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর অবসন্ন দেহে মাতালের মত এক-পা এক-পা করে এগিয়ে এসে টেবিলে ভর দিয়ে দাঁড়ায়···বিড়-বিড় ক'রে সে যেন কি বলছে।]

অভয় : আমার জীবন থেকে শান্তি চলে গেছে। অসহায় উন্মাদের মত রাতের পর রাত বিনিদ্র অবস্থায় কাটাচ্ছি ···কতদিন এমনিভাবে চলতে পারব? আমার এ অবস্থার জন্য কে দায়ী? শিখা কি জানে না যে তাকে প্রাণের অধিক ভালবাসি বলেই আজ আমার এই অবস্থা?···শিখা কি আমায় সন্দেহ করে? ওকি

জেনে গেছে আমি ওব…[হঠাৎ শিখার ছায়া দেখে চম্‌কে]…কে ? কে ?

শিখা : আমি। তুমি অমন ক'রছ কেন ? কি হ'য়েছে তোমার ?

অভয় : না-না—কিছু নয়। তুমি ওরকম অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছ কেন ? আলোটা জ্বেলে দাও…

শিখা : মনের আলো যখন চিরদিনেব জন্য নিভে গেছে, তখন আর বাইরেব আলো জ্বেলে কি হবে ?

অভয় : তাব মানে ?

শিখা : মানে,…নিজের মনের কাছে জিজ্ঞেস কর। গত সাতটা দিন কিভাবে কাটছে… ! তুমি দিন-দিন কি হ'য়ে যাচ্ছ সেটাও বিবেচনা ক'ব।

অভয় : তা-তা-তাব মানে… ? তুমি কি ব'লতে চাও ?

শিখা : পুরুষদের সম্বন্ধে মেয়েদের কিছু না বলাই ভাল। তবে একটা কথা না ব'লে পাবছি না।

অভয় : [ফ্যাল-ফ্যাল ক'বে তাকিয়ে] কি… ?

শিখা : এই সাতটা দিনেব কথা একবার ভেবে দেখ।
গত শনিবার রাত একটার পর থেকে……

অভয় : শনিবার…রাত ১টা…উঃ…

শিখা : তুমি বাইরে প্রকাশ করতে চাইছ কত সহজ ভাবেই হেসে-খেলে জীবন কাটাচ্ছ ; কিন্তু তোমার অন্তরের জ্বালা আমি সব সময় লক্ষ্য করেছি। প্রতিদিন আমার

মনে হয়েছে তোমার সেই শিশু মনের মধ্যে বিরাট জায়গা দখল করে বসে আছে কোন এক নরপিশাচ। যাকে এর আগে কখনো দেখিনি। বল, সে নর-পিশাচ কে এসেছিল তোমার মধ্যে ?

অভয় : সে আমায় বড্ড বেশি বিচলিত ক'বে তুলেছিল। তাই হাজার চেষ্টা করেও আর নিজেকে ঢাকতে পারলাম না। বল, তুমি আমায় ঘৃণা ক'রবে না···আমার প্রতি অবিচার ক'রবে না···

শিখা : না।

অভয় : শিখা, তোমায় আমি ভালবাসি, নিজের প্রাণের চাইতেও বেশি ভালবাসি·········পার্থিব সব কিছুব চাইতে তোমার প্রতি আমার টান ছিল বেশি···তুমি একমাত্র আমারই। এই বিশ্বাসের ওপর যখন আমার আঘাত লাগে তখন এই পৃথিবী আমার কাছে হয়ে যায় অন্ধকার।

[এই সময়ে নেপথ্যে ঠং-ঠং করে দুটো ঘণ্টা বাজার শব্দ হয়, অভয় বিচলিত হয়ে পড়ে]

শিখা : এই শব্দটা প্রতিদিন তোমায় কেন বিচলিত করে বলতে পার ?

অভয় : এই শব্দটার পেছনে রয়েছে খুনের ইতিহাস।

শিখা : খুনের ইতিহাস··· ?

অভয় : হ্যাঁ-হ্যাঁ --শোন, শিখা, আজ আমার মনের সমস্ত জঞ্জাল

আমি সাফ করতে চাই। আমি···আমি আমার একমাত্র বন্ধুকে খুন করেছি··· !!

শিখা : এ্যাঁ···তুমি খুন······ ?

অভয় : হ্যাঁ—আমি—আমি নিজ হাতে তাকে খুন করেছি —আর তা করেছি তোমারই জন্য !

শিখা : আ-আ—আমার জন্য !!

অভয় : হ্যাঁ—একাধারে সে ছিল আমার প্রাণের বন্ধু—আর তোমার আমার মিলনের পথে প্রতিবন্ধক ! বন্ধুর

বন্ধুত্ব থেকে তোমার সঙ্গ আমার অনেক বেশি কাম্য—তাই পথের কাঁটাকে—

শিখা ঃ সরিয়ে দিয়েছ !

অভয় ঃ আমি চেয়েছিলাম পৃথিবীকে পরিপূর্ণ ভাবে ভোগ ক'রতে—তোমাকে সাথে নিয়ে ভোগে-বিলাসে ধাপে ধাপে এগিযে যেতে—কিন্তু সে বন্ধুত্বেব দাবি নিযে প্রতিপদে বাঁধা হ'য়ে দাঁড়াত। সে চাইত, আমাব ব্যক্তিগত জীবনের সব সুখ বিসর্জন দিয়ে ঐ সব সাধাবণ মানুষগুলোর মধ্যে গিয়ে তাদের দুঃখেব জীবনেব অংশীদাব হই!...আজ অমর নেই—তাই আমি পেয়েছি চাকুবীতে ৩০০৲ টাকাব লিফ্‌ট—কাল গাড়ি কিনব—আমাদের জীবনে আসবে ভোগের জোয়ার—

শিখা ঃ ছি-ছি! নিজের জীবনের ব্যক্তিগত সুখের জন্য তুমি তোমাব প্রিয় বন্ধুকে হত্যা ক'বলে ?...এ মুখ নিযে তুমি এখনও পাঁচজনেব মধ্যে ঘুবে বেড়াচ্ছ কি ক'বে ?

অভয় ঃ তাব মৃত্যু কেউ আটকাতে পাবত না, শিখা! মালিকের বিরুদ্ধে শ্রমিকদের ক্ষেপিয়ে মালিকের হাত থেকে কেউ এ পর্যন্ত বাঁচতে পারে নি। তাকে সরিয়ে না দিলে আমার জীবনও বিপন্ন হ'ত !—তুমি জাননা, ম্যানেজারবাবু আমাকে যথেষ্ট ভালবাসেন। তোমার প্রশংসায় তিনি পঞ্চমুখ—বলেন, তুমি এত

সুন্দরী যে একমাত্র স্বর্গের অপ্সরার সাথেই তোমার তুলনা চলে

শিখা : [চটে গিয়ে] ওঃ ! ম্যানেজারবাবু তাহ'লে ভেতরে ভেতরে তোমার হৃদয় জয় ক'রে ফেলেছিলেন !

অভয় : [ফস্ ক'রে ব'লে ফেলে] তোমার হৃদয়ও তো একজন জয় ক'রে ফেলেছিল—!

শিখা : কি ব'লতে চাও তুমি ?

অভয় : বলতে চাই, অমর তোমার সমস্ত হৃদয় জুড়ে বসেছিল। আমার বন্ধু সে—তোমায় দিত প্রেমমাখা ফুলের তোড়া, আর আমায় দিত মর্মান্তিক অন্তর জ্বালা।···আমি কিছুই বুঝতাম না ব'লে তোমরা মনে ক'রতে ! পাপ বেশি দিন চাপা থাকে না, শিখা। তাই যে-পাপ আমার জীবনে আঁচড় কেটেছিল তাকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিয়েছি।

শিখা : তুমি অত্যন্ত ভুল করেছ ?

অভয় : ভুল ? তোমাদের গোপন মেলামেশা প্রেমালাপ— আমি কিছু জানতাম না মনে কর ? যে হাসি তোমার মুখে শত চেষ্টা ক'রেও ফোটাতে পারি নি, তাই অমরের কাছে অত্যন্ত সহজলভ্য ছিল !

শিখা : না !

অভয় : তোমাদের মেয়েদের আমি খুব ভাল ভাবে চিনেছি। তোমাদের মুখে এক, আর অন্তরে আর এক ! স্বামীর

বন্ধুকে প্রেম নিবেদন ক'রতে তোমার বিবেকে বাঁধর্তে না ?

শিখা : তোমার ধাবনা একেবাবে ভুল। হ্যাঁ, অমরদাকে আমি ভালবাসতাম—মনে-প্রাণে শ্রদ্ধা ক'রতাম—নিজের বড় ভাই-এব মত—আর তিনি স্নেহ ক'রতেন আমাকে নিজের ছোট বোনের মত।

অভয় : তাঁব ফোটোখানিও বোধ হয় ভগ্নিপ্রেমেব নিদর্শন হিসেবে পাঠিয়েছিলেন ?

শিখা : না, ফোটো তিনি দেন নি।

অভয় : তবে উড়ে এসেছিল বোধ হয় ? পাপ ঢাকতে গিয়ে আর মিথ্যেব বোঝা বাড়িয়ো না।

শিখা : ফোটোখানা এনে দিয়েছিলে তুমি। দুখানা ফোটো একসঙ্গে—একখানা তোমার আর একখানা অমরদার —পাসপোর্ট ফোটো !

অভয় : আমি—আমি দিয়েছিলাম !!

শিখা : [উত্তেজিত] হ্যাঁ, তুমি। নিজের মনুষ্যত্বকে টাকার জন্য অপরের কাছে বিক্রী ক'রে দিয়ে সমাজের কাছে হয়েছ তুমি চোব, আর নিজেকে দিয়ে পৃথিবীকে বিচার ক'রছ! [আবেগ ভরা গলায়] তুমি কার সম্বন্ধে কি ব'লছ তা তুমি নিজে জাননা। সে যে কত উদার কত মহৎ—এতদিন তার সাথে মিশছ—শুধু নিজের স্বার্থের খাতিরে তাঁর ভেতরে ঢুকবার চেষ্টা

করনি। ছিঃ ছিঃ, অনুতাপে তোমার মরতে ইচ্ছে হয় না ?

অভয় ঃ এ্যাঁ—আমি ভুল করেছি ?

[দ্রুত পায়চারী ক'রে ছুটে টেবিলের কাছে চলে যায়] তা হ'লে আমার জানা দরকার—তুমি [টেবিলের ওপর নজর পড়ে—রবির দেওয়া প্যাকেটটা খুলে ফেলে। তার লেখাটা প'ড়ে শিখার দিকে তাকায়—উত্তেজনায় সে কাঁপতে থাকে। প্রতিহিংসায় হাত মুঠো করে—শিখার দিকে দু হাত বাগিয়ে এগিয়ে যেতে গিয়ে নিজেকে সংযত ক'রে নেয়] হ্যাঁ, আমি ভুল জায়গায় হাত দিয়েছিলাম···। [ভয় পেয়ে] তোমাকে একান্ত আপনার ক'রে পেতে গিয়ে পেয়েছি বুক ভরা বেদনা—ঠিকই বলেছ তুমি। অনুতাপে আমার আত্মহত্যাই করা উচিত।···কিন্তু তুমি, তুমি—আমার সঙ্গে করেছ বিশ্বাসঘাতকতা—তুমি—

শিখা না—

অভয় [ছুটে গিয়ে দেয়াল থেকে একটি ছবি টেনে নিয়ে আসে] যেদিন তোমার সাথে আমার প্রথম শুভদৃষ্টি হয়, মনে আছে সেদিনকার কথা ? সেদিন তোমার হাসি দেখে অনেক ব্যথাই আমি ভুলে গিয়েছিলাম। কে কেড়ে নিল তোমার মুখের সেই প্রাণভোলান হাসি ?

শিখা ঃ তারপর এল ফুল শয্যার রাত—আকাশে ছিল চাঁদের আলো—ঘরে ছিল ফুলের গন্ধ—

অভয় ঃ তা-র-প-র [মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে]

শিখা ঃ তারপর সেই ব্যর্থ রাতের কাহিনী। এমনি রাত আরো কত এসেছে। বল, মুখের হাসি বিলীন হবার জন্য কি শুধু আমিই দায়ী ছিলাম ? [একটু থেমে] তুমি চেয়েছিলে সুন্দর একটা ছবি। তাকে বাঁধিয়ে-সাজিয়ে রাখবে !···আর আমি চেয়েছিলাম একজন রক্ত মাংসে গড়া মানুষ।···তুমি ছবি চেয়ে পেয়েছ বেদনা, আর মানুষ চেয়ে আমি পেয়েছি শুধু ব্যথা। আগেই তোমার বোঝা উচিত ছিল মানুষ বেশিক্ষণ পুতুল-নাচ নাচতে পারে না। মানুষের স্বভাব সংস্কার ক'রতে পার—তাতে সময় লাগে। কিন্তু স্বভাবকে মেরে ফেলে মানুষকে পুতুল করতে চাওয়াটা ঠিক নয়।

অভয় ঃ এত কথা তো তুমি এর আগে কোন দিন বল নি !

শিখা ঃ বলিনি এই জন্য যে, তোমাকে দেখে আমার মায়া হ'ত। তোমার শিশু মনকে আমি ভালবাসতাম। তাই তোমাকে দুঃখ দিতে চাইনি ব'লে আঘাত করি নি। আমিও ভবিষ্যতের সুখের স্বপ্ন দেখেছিলাম··· কিন্তু তোমার ব্যর্থতা আমার স্বপ্ন ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়েছিল।

অভয় : থাক, থাক, আর বলতে হবে না—

[এই সময়ে প্রথমে দুটো ঘণ্টা বাজার শব্দ হ'ল। সংগে সংগে অভয় ভীষণ ভাবে ছটফট করতে লাগল, এবং তৃতীয় ঘণ্টা বাজার সংগে সংগে ছুটে ভেতরে চলে গেল। তারপর আরো তিনটে ঘণ্টা বাজার শব্দ শোনা গেল। নেপথ্যে কাক কোকিলের কণ্ঠস্বর শোনা যায়। ঘরে রাতের অন্ধকার শেষ হ'য়ে দিনেব আলো এসে পড়েছে। প্রবেশ করে রবি—হাতে একটা সুটকেশ।]

রবি : শিখা, আমি—আমি এখান থেকে মাস খানেকের জন্য বাইরে চলে যাচ্ছি। আর আমার পক্ষে এখানে আসা সম্ভব হ'চ্ছে না। একদিকে সংগঠনের দুরবস্থা—অন্যদিকে তুমি । তাই আমি ঠিক ক'রলাম কিছু-দিন বাইরে ঘুরে এলে হয়তো মনের পরিবর্তন ঘটতে পারে। যাবার সময় তোমাকে দুটো কথা ব'লতে এলাম। আমাদের দেশের মেয়েরা···এ-একি, তুমি পাথরের মত দাঁড়িয়ে আছ কেন? কি হ'য়েছে?

[ভেতর থেকে শোনা যায় একটা গুলির শব্দ। রবি ভেতরে চলে যায়—পর মুহূর্তে আর একটা গুলির শব্দ শোনা যায়। শিখা চমকে উঠে স্থির হ'য়ে এক-জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে। কিছুক্ষণ কেটে যাবার পরে রবি একটা চিঠি নিয়ে প্রবেশ করে।]

রবি : অভয়দার চিঠি···[শিখার হাতে দিল। শিখা চিঠিটার

দিকে হতভম্ভ হ'য়ে তাকিয়ে রহিল। ভেতর থেকে শোনা গেল চিঠিটার পাঠ :]

শিখা,

জীবনের ঠিক শেষ মুহূর্তে এসে জীবনের শেষ কথাটি তোমায় জানিয়ে গেলাম। আমার জন্যে দুঃখ পেওনা, শিখা। এই আত্মঘাতী মৃত্যুর আগেই আমার মরণ হয়ে গেছে। ভুল—অসংখ্য ভুল মৃত্যুর মত বিভীষিকায় আমাকে অন্তরে-বাইরে উন্মাদ করে তুলেছে।

আর ঠিক জীবনের শেষ মুহূর্তে এসে আমি বুঝতে পারলাম যে-সুখ যে-স্বপ্ন যে-কামনা-বাসনা-আকাঙ্ক্ষা যে-ভালবাসা যে-সাজানো সংসার—সংসারের আনন্দ আমি প্রতিদিন উদ্‌ভ্রান্তের মত খুঁজে বেড়িয়েছি, তার ভিত্তিটুকুও মিথ্যা। ভুল আর মিথ্যা, সমস্ত জীবন মরীচিকার পিছনে ছুটে বেড়ানোর কি যন্ত্রণা সে তুমি বুঝবে না, শিখা।

পৃথিবীতে যখনই যা কিছু সুন্দর আমার চোখে পড়েছে, অমনি ভেবেছি তোমার মুখ। তোমার জন্যে সংগ্রহ করে এনেছি পৃথিবীর যা কিছু সুন্দর সম্ভার। এমন কি পৃথিবীকেও আমি ভুলে গেছি বহুবার তোমার মুখের দিকে তাকিয়ে চোখের তারায় হারিয়ে।

সত্যি—আমি তোমায় ভালবাসতাম, শিখা। তোমার সুখ, তোমাকে নিয়ে স্বপ্ন গড়া, এ ছাড়া……

নাঃ—আর লেখা হ'ল না—আমার সময়ের ঘণ্টা বাজছে।

[শিখা নিশ্চল পাথরের মত দাঁড়িয়ে আছে। রবি সুটকেশ হাতে চলে যাচ্ছিল—একবার শিখা রবির দিকে তাকাল। রবি ফিরে একবার তাকাল।

॥ পর্দা পড়ল ॥

হরিপদ মাস্টার

সুনীল দত্ত

দাম ঃ দেড় টাকা

সুনীলবাবু,

আপনার আগের নাটকের চেয়ে এ-নাটক অনেক ভালো হয়েছে। আজকে যখন আমাদের ভীষণ নাটকের দরকার তখনই কিন্তু ভীষণ নাটকেব অভাব। এ অভাববোধের ভিতর থেকেই অবশ্য অভাব পূরণ করবার শিল্পী জন্মাবে। কিন্তু সেই ক্ষণজন্মা শিল্পীর চলাবার পথ সহজ করবার জন্যে আমাদের মতো বহু মামুলি শিল্পী-নামধারীকে বহু আয়াসে একটু মেঠো পথ রচনা ক'রে যেতে হবে। সেই পথে আপনি ও আমি সহযাত্রী। ইতি—

শম্ভু মিত্র

৩।৪।৫৫

······শিক্ষাব্রতীদের জীবনের দুঃখ-বেদনা, ত্যাগ, সহিষ্ণুতা ও ট্রাজিডি লইয়া বিরচিত নাটক। ঘটনাগুলির মধ্যেও সংবেদনশীল মন ও উদার দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। —যুগান্তর

৬।৩।৫৫

······একজন শিক্ষকের পারিবারিক অবস্থা ও নিজের উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে জটিল সমস্যার মধ্যে ঘাত-প্রতিঘাতের ভেতর দিয়ে তার পরিণতিতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সুনীলবাবু খুব সহজ ভাবে নাটককে একটা নতুন পথে নিয়ে যাবার চেষ্টা করেছেন। নাট্যামোদী মহলে এ নাটক যথেষ্ট আগ্রহ সৃষ্টি করবে। —দৈনিক বসুমতী

৬।৩।৫৫

……গত শিক্ষক ধর্ম্মঘটকে ভিত্তি করে একটি দ্বিধাজড়িত শিক্ষকের মানসিক রূপান্তর নাটকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। চরিত্র বৈশিষ্ট্য ও ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে হরিপদ মাষ্টার সজীব হয়ে উঠেছে। পার্শ্বচরিত্র-গুলিও বেশ সরস। সংলাপ স্বাভাবিক।

—স্বাধীনতা

৬।৩।৫৫

……বাংলাদেশের শিক্ষক সমাজ নিয়ে কোন পূর্ণাঙ্গ নাটক লেখা হয়েছে বলে আমার অন্তত জানা নেই। সেই দিক থেকে সুনীল দত্ত তাঁর প্রচেষ্টার জন্য আমাদের ধন্যবাদার্হ। যাঁরা বলেন বাংলাদেশের জীবনে নাটকের মালমশলা নেই, সুনীলবাবু তাদের ভ্রান্তিনিরসনে অনেকখানি সাহায্য করেছেন, একথা নিঃসন্দেহ। হরিপদ মাষ্টারের পরিবর্তনই নাট্যকারের প্রতিপাদ্য বিষয়। এবং তা দেখাতে গিয়ে তিনি হরিপদ বাবুর পারিবারিক চিত্র, বর্তমান ছাত্র ও ইস্কুলের যে চেহারা এঁকেছেন তা অনেকাংশেই বাস্তবের অনুরূপ।

বিষয় বস্তুর বাস্তবতা সম্পর্কে তিনি আশ্চর্য সততার পরিচয় দিয়েছেন। হরিপদ মাষ্টারের জীবন কাহিনী আজকের দিনের শিক্ষক সমাজেরই প্রতীক স্বরূপ। তাছাড়া অন্যান্য চরিত্র-সৃষ্টিতেও তিনি অনেকখানি সফলতা অর্জন করেছেন। আমরা আশা করব, ভবিষ্যতে সুনীলবাবু নাট্যকার হিসাবে তাঁর দুর্বলতাগুলি কাটিয়ে উঠবেন এবং এর চেয়ে শক্তিশালী নাটক উপহার দেবেন।

—নতুন সাহিত্য

নববর্ষ সংখ্যা ১৩৬২